



মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং-২৭২

২৩ তম বর্ষ

একাদশ সংখ্যা

নভেম্বর ২০১৭ ঈসাবী

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

স্বাগতম মাহে রবিউল আউয়াল



ইয়া নবী সালামু আলাইকা



মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি
বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্যদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা
কমিটিসমূহের বার্ষিক সম্মেলন ২০১৭-এ
একজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখছেন

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাগুরী (কঃ)-এর ২৯তম উরস্ শরিফ
উপলক্ষে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায়
৬ দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'কুরআন ও
সুন্নাহর আলোকে সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ'
শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন 'দুদক' চট্টগ্রাম
বিভাগীয় পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ



বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাগুরী (কঃ)-এর ২৯তম উরস্ শরিফ
উপলক্ষে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায়
৬ দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে
'বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা শিবিরে'
চিকিৎসা-সেবা কার্যক্রম

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাগুরী (কঃ)-এর ২৯তম উরস্ শরিফ
উপলক্ষে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায়
৬ দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে উরস্ শরিফের
পরদিন দরবার শরিফ এলাকায় 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
কর্মসূচি'র একাংশ



সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী
মিলনায়তনে মাইজভাগুরী একাডেমি আয়োজিত
'সুফি দর্শনে পরমত সহিষ্ণুতা ও বিশ্বশান্তি' শীর্ষক
সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন চ.বি. উপাচার্য প্রফেসর
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

মাসিক আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং ২৭২, ২৩তম বর্ষ, ১১ সংখ্যা

নভেম্বর ২০১৭ ইসাযী
সফর-রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

যোগাযোগ:

লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
US \$=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫



শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাগুরী (ক.) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web: www.sufimaizbhandari.org

E-mail: sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়:

■ তাহকীকুল কুরআন : সূরা আল বাক্বারাহ শরীফ (পর্ব-৭)

অধ্যক্ষ আল্‌হাজ্জ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাগুরী

■ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয় জহুর উল আলম

■ হযরত বাবা ভাগুরীর কেরামত বিষয়ক তথ্য উপাত্ত

আলোকধারা ডেস্ক

■ শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী সম্পর্কে সমকালীন বিশিষ্টজনদের অভিমত

ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

■ তাওহীদের সূর্য : মাইজভাগুর শরিফ এবং বেলায়েত মোতলাকার উৎস সন্ধানে

জাবেদ বিন আলম

■ 'তাক্ফিরী গোষ্ঠীর প্রতিভু', 'মুনকেরে আকীদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত', 'গোস্তাখে গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী', আল-মাইজভাগুরী ম্যাগাজিন ডেস্ক'র স্বরূপ উন্মোচন, তাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চলমান পর্ব ২

আলোকধারা ডেস্ক

■ 'ঐতিহাসিক লালদীঘি' ময়দানে প্রকাশ্যে মোনাজেরার আহ্বান

গাউসুল আযম মাইজভাগুরী'র 'জীবনী ও কেরামত'

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের বিবৃতি

মাসিক 'জীবন বাতি' ২৯ আশ্বিন ২০১৭ সংখ্যা

■ সরকারী সফরে 'মাইজভাগুরী মরমী গোষ্ঠী' মিশরে

অধ্যাপক এ. ওয়াই. এম. জাফর

মিয়ানমারে ঘটনার প্রেক্ষিতে গাউসিয়া হক মন্জিলের

সাজ্জাদানশীনের সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত বিবৃতি

■ মাইজভাগুর দরবার শরিফে : মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আলোকধারা প্রতিবেদন

সম্পাদকীয়...

১. তাসাওউফ বিষয়ক পত্রিকা আলোকধারা বর্তমানে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হওয়ায় তিন মাসের মধ্যে আমাদের সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বাৎসরিক গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে আলোকধারার ত্রৈমাসিক সংখ্যায় দিবস সমূহের ওপর আলোকপাত করা সম্পাদকীয় বিভাগের বিধি গত বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আলোকধারা সংখ্যা প্রকাশকালে ইসলাম ধর্মের অন্যতম ফরজ ইবাদত পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন হয়েছে। “লাব্বায়িক, আল্লাহুমা লাব্বায়িক, লা-শারিকাল্লাকা লাব্বায়িক” ধ্বনিত কান্না এবং আহাজারির মাধ্যমে পৃথিবীর বুকের প্রথম গৃহ খানায়ে ক্বাবা তাওয়াফ সম্পন্ন করেছে বিভিন্ন ভাষা বর্ণ সংস্কৃতির লক্ষ লক্ষ মুসলমান। হজ্জের শ্বেত বস্ত্র পার্থিব সীমাবদ্ধ জীবন সম্পর্কে প্রতিটি মুসলমানকে সচেতন করে থাকে। হজ্জের চেতনা আমরা যদি প্রতিনিয়ত লালন-ধারণ করতে পারি তাহলে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম, স্বার্থপরতা, দাঙ্গিকতা এবং বস্তুবাদী দর্শনের নির্দেশিকা থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হব।

২. হজ্জের অন্যতম আনুসঙ্গিক বিধান হচ্ছে পবিত্র মদীনায়ে উপস্থিত হয়ে রওজা আকদসে মহানবীর (দঃ) কদমে সালাত সালাম পেশ করা। আমাদের কলেমায় (অঙ্গীকার বাক্য) মহান আল্লাহ এবং মহানবী (দঃ) অভিন্ন সূতায় একাত্ম হয়ে তাওহীদের মর্মবাণী ঘোষণা করেছেন। এ জন্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ধ্বনি তুলেছেন, “তৌহীদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম। মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম। ঐ নাম জপিলেই বুঝতে পারি। খোদাই কালাম/মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম। ঐ নামেরই রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে/ ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে, ঐ নামেরই বাতি জ্বলে দেখি লোহ আরশ-ধাম/ মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম/ ঐ নামেরই দামন ধরে আছি, আমার কিসের ভয়।/ ঐ নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয়।/ তাঁর কদম মোবারক যে আমার বেহেশতি তাজ্জাম/ মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।” আজকাল মুসলমানদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আল্লাহ এবং মহানবী (দঃ) এর অভিন্ন অবস্থানকে অস্বীকার করতে চায়। এরা মূলতঃ বিভ্রান্ত, পথহারা বাতিল গোষ্ঠী। আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক এবং সচেতন থাকার আহ্বান জানাই।

৩. অক্টোবর ২০১৭ সংখ্যা প্রকাশ সময়ে মুসলিম জাহানের দুয়ারে হাজির হয়েছে দশ মুহররম। এ মাস কান্না এবং প্রত্যয় দ্বীপ্ত শপথ নেয়ার মাস। কারবালা প্রান্তরে আহলে বাইত হযরত ইমাম হোসাইনের (রাঃ) শাহাদত বরণের মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের মৌলিক ধারা সংহত ও সংরক্ষিত হয় এবং ইসলাম ধর্ম পুনর্জীবন লাভ করে। দশ মুহররমে হযরত ইমাম হোসাইনের (রাঃ) পবিত্র শোনিতির স্রোতধারায় উড্ডীন হয়েছে চাঁদ তারা খচিত লাল পতাকা। ইমামের পবিত্র রক্তের বদলায় ইসলাম ধর্ম ‘রাজ ধর্মে’ সংক্ষেপিত না হয়ে গণমানুষের ধর্মে স্থিত থেকে গতিময় হয়েছে। প্রতিটি মুসলমানকে নতুনভাবে স্পন্দিত করেছে কারবালা। তাই কবি নজরুল লিখেছেন, “মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়। ওয়া হোসেন, ওয়া হোসেন তারি মাতম শোনা যায়।” কারবালা বিশ্বের প্রতিটি মুমিনের জন্য সত্য পথের লড়াকু নির্দেশনা।

৪. এ সময়কালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস হচ্ছে হযরত বাবা

ভাণ্ডারী কেবলা আলমের খোশরোজ শরিফ। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার অন্যতম দিকপাল বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম তাসাওউফ জগতের বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর সাধনা এবং কর্মরীতির কারণে তিনি নিজেই নিজের উপমা। ঐশী প্রেমের উন্মুক্ত ধারায় তাওহীদ প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি আরো অধিকতর গণমুখি ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক নির্দেশে বাংলার লোক সংগীতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, লোকপ্রিয় ও লোকনন্দিত কবিরাজ রমেশ শীল মাইজভাণ্ডারী গানে ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণীয় নতুনতর ব্যঞ্জনা দেন। বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের নির্দেশের আলোকে রমেশ শীল মাইজভাণ্ডারী জিকির মাহফিলের উচ্চমার্গীয় গানগুলোকে মূলতঃ জনপ্রিয় গণসংগীতে রূপান্তরিত করেন। এখন মাইজভাণ্ডারী গান সামা-মাহফিলের পাশাপাশি যে কোন মেলা, উৎসব এবং জনসমাগমে গীত হয়ে থাকে। এতে সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ তরুণ যুবকদের মনে তাওহীদ সম্পর্কে কিছুটা হলেও উপলব্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে এবং হচ্ছে। বস্তুতাত্ত্বিক আকাশ-সংস্কৃতিতে অনৈতিকতা এবং অপরাধ প্রবণতাকে যেখানে উন্মুক্ত করা হয়েছে, সেখানে মাইজভাণ্ডারী গান গণ সংগীতে রূপ নেয়ায় সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে সচেতন বাংলা ভাষীদের বিবেককে জাগ্রত রাখতে এটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম প্রবর্তিত উন্মুক্ত ঐশী প্রেম ধারার গণমুখি প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে মূলতঃ বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম হলেন মৌলিক অনুঘটক ও প্রধান পথ নির্দেশক। উল্লেখ করা সঙ্গত যে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম দীর্ঘ ২৩ বছর নির্বাকতায় কাটিয়েছেন। এটি ছিল প্রচণ্ড নীরবতা। আল্লামা রুমীর ভাষায় আধ্যাত্মিক সাধকের প্রেমের চূড়ান্ত রহস্যকে উপলব্ধি করতে হলে নীরবতাকে উপলব্ধি করতে হবে। মহান খোশরোজ দিবসে আমরা তাঁর প্রতি নিবেদন করি বিনম্র শ্রদ্ধা।

৫. যে মহান ঐশী ব্যক্তিত্বের স্মরণে ও পরশে তাসাওউফ ভিত্তিক পত্রিকা আলোকধারা প্রকাশিত হয়েছে তিনি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম। ২৬ আশ্বিন ১১ অক্টোবর তাঁর বার্ষিক উরস শরিফ। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে চলমান সময়ের গণমানুষের নিকট শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলার পরিচিতিমূলক বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। কারণ শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারী এতো বেশী জনপথ সফর করে সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত জনশ্রেণী এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা-মকতবের শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদেরকে পবিত্র সান্নিধ্য দিয়েছেন তা মূলতঃ বেহিসাব-বেমেসাল। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বেলায়তের সর্বোচ্চ মর্তবা মজবুবে সালেকের রহস্যপূর্ণ পদবীতে অবস্থান করে সাধারণ মানুষের নিকট অকাতরে তিনি তাওহীদ সম্পর্কিত ‘খিজরী ধারা’ সম্পর্কে সহজবোধ্য ধারণা প্রদান করেছেন। তাঁর পবিত্র জবান থেকে বাক্যগুচ্ছ কালাম শুনে অনেকে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছেন। পবিত্র কালামের সঙ্গে ঘটনার হুবহু মিল দেখে সাধারণ মানুষ সুস্পষ্ট নির্দেশনা পেয়েছেন যে, মাইজভাণ্ডারী শরিফ শুধু ভাববাদী দর্শনের কেন্দ্র নয়, বরং সত্যনিষ্ঠ কর্ম দর্শনের অকৃত্রিম প্রাণকেন্দ্রও বটে। আজকের এ দিনে শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম কর্তৃক ঘোষিত জীবন জগত সম্পর্কিত নৈতিক নির্দেশনার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য নিবেদন করছি। আমিন!

তাহকীকুল কুরআন

সূরা আল-বাক্বার শরীফ (পর্ব-৭)

• অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী •

[বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রণীত তাফসীর-এ-সূরা ফাতিহা শরীফ মাসিক আলোকধারায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পর্বে পর্বে ক্রমশঃ সূরা আল বাক্বার শরীফের তাফসীর প্রকাশ করা হচ্ছে।]

আলহাম্দু ওয়াসসানাউ ওয়াশশুকরু লিল্লাহিল্লাজী নাওয়ারানা বিনুরিল ইমান, ওয়া আফ্বালুসসালাতু ওয়া আযকাসসালামু ওয়া আহসানুত্তাহুইয়াতু আলা মান খাসসাহ্ বিল্ কুরআন, আল্লাজী লাইছা লাহ্ নজীরুন ওয়া লা মিচালুন ওয়া লা চান। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহলি বাইতিহী ওয়া আসুহাবিল্লাজীনা কামূ বিল্ ফুরকান, ওয়া আলা আত্বায়ুল্লাজীনা তাবিয়ুহুম বিল্ ইহসান, বিল্ খসুসি আলা গাউসুল আযম আশশাহ আসসূফী আসসৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ আলমাইজভাণ্ডারী ওয়া গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবাভাণ্ডারী আশশাহ আসসূফী আসসৈয়দ গোলামুর রহমান, ওয়া আলা আওলাদিহীমা ওয়া আহলি তুরীক্বাতিহীমাল্লাজীনা সাবাকূনা বিল্ ইমান। আম্মাবাদ.....

সবর এর শ্রেণী ভেদঃ কুরআন ও হাদীস শরীফের পরিভাষায় 'সবর' এর তিনটি শাখা রয়েছে। (১) নফস কে হারাম এবং না যায়েজ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা, (২) ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (৩) যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ- যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর তরফ থেকে মনে করে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবরের পরিপন্থী নয়, (সূত্র- ইবনে কাছীর)। উক্ত তিন প্রকারের সবর অবলম্বনকারীদেরকে হাশর ময়দানে আহ্বান করা হবে যে, 'ধৈর্য ধারণকারীরা কোথায়? এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে সব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে (সূত্র- ইবনে কাছীর)

আল্লাহর সান্নিধ্যঃ নামাযী এবং সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহর শক্তি সম্পৃক্ত হয় সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি বা সংকটই টিকে থাকতে পারে না। বান্দাহ যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারো থাকে না। এ শক্তি মকসুদ হাসিল করা ও সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে নিশ্চিত ও অমোঘ উপায়। এ নিশ্চয়তা প্রদান করে আল্লাহ পাক সূরা বাক্বারার ১৫৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন- 'ইল্লাল্লাহা মায়াস্ সাবেরীন' অর্থাৎ- নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

দৃষ্টি ভঙ্গির তফাৎঃ মানুষের দৃষ্টি শক্তি রয়েছে বটে দর্শন করা

সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে দেখবে সে জান্নাতী হয়ে যাবে। এক প্রতিবাদকারী, প্রতিবাদ করে বলল যে, আবু জেহেল তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে বটে বেহেশতী হতে পারেনি। লোকেরা আপনাকে দেখে কী ভাবে জান্নাতী হয়ে যাবে? ঐ বুজুর্গ আল্লাহর ওলী উত্তর দিলেন আল্লাহর কসম আবু জেহেল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নাই। বরং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে দেখেছে। কেননা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দর্শনকারী চক্ষু জাহান্নামে যেতে পারে না। তত্ত্ব কথা হলো- লায়লাকে দেখার জন্য মজনুর চক্ষু হতে হবে আর জামালে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য সিদ্দিকী দৃষ্টি ভঙ্গি আবশ্যিক। একারণে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- "ওআ তারাহুম ইয়ানজুরুনা ইলাইকা ওআহুম লা ইউবশ্বিরুন"। অর্থঃ ওহে মোর প্রেমাম্পদ! তারা তো আপনাকে দেখতেছে বটে প্রকৃত পক্ষে তারা দেখতেছেন। (সূরা- আ'রাফঃ ১৯৮) অর্থাৎ- যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে হবে তার বিপরিত হলে সে দেখা বাস্তব দেখা হবে না। এই কারণে বাতিল ফিরকার লোকদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সুন্নী আক্বীদার পরিপন্থী নানা ধরণের মন্তব্য করতে দেখা যায়। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে চলেছে। এদের নিকটে থেকে সাবধান থাকা অপরিহার্য।

মনের ধারণাঃ অন্তরের ধারণা দু ধরণের হয়ে থাকে- (১) রহমানী ইলহাম, (২) শয়তানী ওয়াছওয়াসা। সাধারণত অন্তরে কল্পনায় ভাল ধারণাও আসে আবার মন্দ ধারণাও আসে। সুধারনার জন্য একজন ফিরিশতা নিয়োজিত থাকে। যেটাকে রহমানী ইলহাম বলা হয়। আর শয়তান প্ররোচনা দিয়ে কুধারণার উৎপত্তি করে। এটাকে বলা হয় শয়তানী ওয়াছওয়াসা। এটা মু'মিনদের অন্তরে কম হয়ে থাকে। বরং কোন কোন আল্লাহর বান্দা এমনও আছেন, যারা ঐ ধরণের শয়তানী ওয়াছওয়াসা থেকে একেবারে নিরাপদ হয়ে যান। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত তাদের ইলহাম কম তাদের ওয়াছওয়াসা হয় বেশী। যদি কোন কামিল রুহানী চিকিৎসক বা পীর মুর্শিদ দ্বারা ব্যাধি সারানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে তা সেরে উঠতে পারে। নতুবা রোগ ক্রমবৃদ্ধি হতে থাকবে। যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তার অন্তরে কোন ভাল ধারণা আসা বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে ভাল কাজকে মন্দ এবং মন্দ

কাজকে ভাল বুঝতে আরম্ভ করে। তখন সে বদকার লোকদের পছন্দ করে আর নেককারদেরকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে ফলে তার অন্তর মৃত হয়ে যায় (সূত্র- তফসীরে নঈমী)।

আলমে বরযখের বর্ণনাঃ ইসলামী বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে বরযখ বা অন্তরাল জগত কিম্বা মৃত্যু হতে কিয়ামত অবদি সময়কালে বিশেষ ধরণের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে। এ জীবন প্রাপ্তির ব্যপারে মুমিন-কাফির এবং পূণ্যবান ও গুনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্ব শ্রেণীর লোকই সমানভাবে অংশীদার। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেককার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য তারতম্য অনুসারে বিদ্যমান রয়েছে। (তফসীর মাআরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা-৭৯)

পরজগতে নবী ও শহীদগণের হায়াত বা জীবনঃ আলমে বরযখে বা পরজগতে পর্দা করার পর নবীগণ ও শহীদগণ খুবই শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন হায়াত বা জীবন লাভ করে থাকেন। যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে তাঁদেরকে মৃত বলে দৃশ্যমান হলেও তাঁদের অন্যান্যদের সমপর্যায়ভুক্ত ধারণা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশী মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

আওলিয়া-ই-কিরামও জীবিতঃ বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ। কোন কোন হাদিছ দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আওলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা, আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তারা শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। ১৫৪ নং আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী সে কথাই প্রমাণিত হয়: **“ওয়ালা তাকুলু লিমাই ইউকতালু ফী ছাবীলিল্লাহি আমওয়াত, বাল আইইয়াউন ওয়ালা কিলা তাশযুকুন”** অর্থাৎ- আর যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাঁদের মৃত বলা না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: **“ওয়ালা তাহছাবান্নাল্লাজীনা কুতিলু ফী ছাবিলিল্লাহি আমওয়াতা বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহীম ইউরযাকুন”** অর্থাৎ, যাঁরা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদেরকে মৃত বলে ধারণাও করো না, বরং তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত, তাঁদেরকে (স্বয়ং আল্লাহ পাক) অবিরতভাবে রিজিক দান করে থাকেন। (সূরা- আলে ইমরান : ১৬৯)

উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে বিশ্বখ্যাত তফসীর রুহুল বয়ান ও তাবিলাতে নজুমিয়াতে বিবৃত হয়েছে যে, **“ইন্না হায়াতাল আম্বিয়া-এ-ওয়াল আউলিয়া-এ-হায়াতুন দায়েমান (আবদিয়াতুন) লা ইয়াকতাউহাল মাউতুছ ছুরীউ”** অর্থাৎ

সন্দেহাতীতভাবে নবীগণ ও ওলীগণের হায়াত বা জীবন হলো চিরস্থায়ী। দৃশ্যত মৃত্যু তাঁদের হায়াত জীবনের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না; ফলে তাঁরা অমর। বাহ্যিকভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে পর্দা করত অন্তর্ধান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক আপন কুদরতে কামেলা দ্বারা তাঁদেরকে এমন পবিত্র হায়াতে চিরজীব করে দেন যে, যাতে তাঁরা তাঁদের রওজা শরিফে জীবিত থাকেন এবং যত্রতত্র বিচরণও করতে পারেন। **ইলমে দ্বীনের প্রকাশ ও গোপন করা প্রসঙ্গেঃ** ১৫৯ নং আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায়, আল্লাহর যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা কঠোরতর মহাপাপ। এর স্বপক্ষে ইবনে মাজা শরিফে হযরত আবু হুরায়রা ও আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: **“যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।”** পক্ষান্তরে সহীহ বুখারী শরিফে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন যে, **“সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে।”** (কেননা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার কারণে তারা ফিৎনা ফ্যাসাদের সম্মুখীন হতে পারে)

তওহীদের মর্মার্থঃ ১৬৩ নং আয়াতের ভাষ্যে আল্লাহ তা'আলার তওহীদ বা একত্ব সপ্রমাণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- **“ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ, লা ইলাহা ইল্লা ছয়ার রাহমানুর রাহীম”** অর্থাৎ, আর তোমাদের মা'বুদ হলেন- একমাত্র মা'বুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই; কিন্তু তিনিই মহান দয়ালু, করুণাময়। একত্ববাদের বিশ্বাস্য বস্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে: (১) তিনি একক, (২) সমগ্র বিশ্বে না আছে তাঁর তুলনা, (৩) না আছে তাঁর সমকক্ষ, (৪) একক উপাস্য হওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই, (৫) তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, (৬) সত্ত্বার দিক দিয়েও তিনি একক, (৭) তিনি কখনো অংশবিশিষ্ট নন, (৮) তিনি অংশী ও অঙ্গ প্রতঙ্গ থেকে পবিত্র, (৯) তাঁর বিভক্তি কিংবা বিচ্ছেদ হতে পারে না, (১০) তিনি আদি সত্ত্বার দিক দিয়েও একক, (১১) তিনি অনন্ত সত্ত্বার দিক দিয়েও একক, (১২) তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন যখন অন্য কিছুই ছিলনা, (১৩) তখনো বিদ্যমান থাকবেন যখন কোন কিছুই থাকবেনা, (১৪) তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যাকে ওয়াহিদ বা এক বলা যেতে পারে। বর্ণিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে এ আরবী শব্দ ওয়াহিদ এর মধ্যে। (জাসসাস)

অবতীর্ণের কারণঃ ১৬৩ নং আয়াতের শানে নুযূল বা অবতীর্ণের কারণ হলো- কাফিরগণ রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, **“আপনি আল্লাহ পাকের শান অর্থাৎ মর্যাদা-মহাত্ম্য ও গুণাবলী বর্ণনা করুন”** এর জবাবে এ আয়াত শরিফ অবতীর্ণ হয়েছে। এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে, উপাস্য শুধু একই। অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র একত্ববাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহা মর্যাদা ও সর্ব গুণাবলী সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়

• জহুর উল আলম •

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম ছিলেন আধ্যাত্মিক সোপান অনুযায়ী সুউচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত “ফরদুল আফরাদ”। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সার্বিক বৈশিষ্ট্যগতভাবে শ্রেষ্ঠতরদের মধ্যে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ; উত্তমদের মধ্যে সার্বিক বৈশিষ্ট্যে যিনি অতি উত্তম। বেলায়তে খিজরী হিসেবে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম হলেন “জামে উত্ তনজিহ ওয়াত্তশবীহ্”; অর্থাৎ অতীত ধর্মাদি এবং বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ত্বরিকত পন্থার সমাবেশকারী হিসেবে যে কোন ধর্ম এবং ত্বরিকা অবলম্বন কারীকে বাহ্যত স্ব স্ব ধর্ম এবং ত্বরিকা ও মতবাদে ঠিক রেখে নিজ বেলায়তের ধারা বা পদ্ধতি অনুযায়ী ফয়জ বিতরণে সমর্থ। এ পন্থা মূলত সর্বজনীনভাবে মানবজাতির জন্য উন্মুক্ত থাকায় ধর্মাদির পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহ বিভিন্ন ধারা ও মতবাদের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। বেলায়তের এ ধারার উন্মুক্ত অবস্থান সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করতে গিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন, “পৃথিবীর যে কোন অবস্থান থেকে যে কোন ব্যক্তি আমার সাহায্য প্রত্যাশী হলে আমি তাকে সাহায্য করব। আমার সরকারের এ রীতি হাশর তক্ বলবত থাকবে।” জামে উত্ তনজিহ্ ওয়াত্তশবীহ্ মূলতঃ বেলায়তের এ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত বিষয়। ধর্ম, বর্ণ, ত্বরিকা এবং মতবাদ নির্বিশেষে বাধাহীন বেলায়তী ধারা তথা উন্মুক্ত ঐশী প্রেম জোয়ারের প্রবর্তক হিসেবে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম হলেন বেলায়তে মোতালাকার প্রতিষ্ঠাতা এবং অভিভাবক। তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি পরগনার মাইজভাণ্ডার গ্রামে। এ গ্রামের অদূরে গিরি পর্বত সংলগ্ন পর্বতশ্রেণীর বিস্তৃতি চীন, যতুন ও তিব্বতের পর্বত শ্রেণী পর্যন্ত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন এলাকা চীনের পাদদেশ হিসেবে পৃথিবীর ভূগোল বিশারদদের নিকট পরিচিতি পায়। উল্লেখ্য যে, পর্বতের অবিচ্ছিন্ন ধারা সুদীর্ঘ হওয়ায় তখন চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকার বন ভাদরে তিব্বতী কস্তুরী মৃগ (হরিণ) ঘুরে বেড়াত। পার্বত্য অঞ্চলের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সীমাহীন। এ অঞ্চল ব্রহ্মদেশ, মখলী ও মনিপুরের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক ভূগোল বিশারদ জানিয়েছেন পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ের সারি সিলেটের পাহাড়ি শ্রেণীর সঙ্গে মিশে গেছে। কেউ কেউ মনে করেন চীন দেশের দক্ষিণ অঞ্চল কোচিন চীন পর্যন্ত চট্টগ্রামের পার্বত্য সারি বিস্তৃত। পৃথিবী বিখ্যাত পর্যটকরা এ সকল ভৌগোলিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে চট্টগ্রামকে চীনের পাদদেশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ্য যে চীন প্রাচীন সভ্যতার একটি হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় চীনের ঐতিহাসিক

পরচিতি ছিল। পৃথিবীখ্যাত পরিব্রাজকরা দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে মানব সভ্যতা এবং জনবসতির যে চিত্র সুদূর অতীত থেকে বিবরণী হিসেবে দিয়েছেন তাতে চীনের নাম প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে সহজে পরিচিতি পায়। শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী মূলতঃ ঐতিহাসিক তথ্য চিত্র অনুযায়ী খাতেমুল অলদের আবির্ভাব স্থানকে চীনের পাদদেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া শায়খুল আকবর ছিলেন প্রখর দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন অলি আল্লাহ্ যিনি পরম করুণাময় আল্লাহর জ্যোতিতে জ্যোতিস্মান ছিলেন বলে অলি আল্লাহদের বিভিন্ন বিবরণীতে উল্লেখ আছে।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমি চট্টগ্রামের ইতিহাস জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং জনগোষ্ঠীর বিচিত্রতায় ভরপুর। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী চট্টগ্রামকে নিজেদের প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী নামকরণ করেছে। পর্যটক ইবনে বতুতা সবুজ গাছপালা শস্য শ্যামলা এবং বিভিন্ন বনভাদরের সমারোহ দেখে চট্টগ্রামের নাম দিয়েছেন সবুজ শহর। আরব বণিকরা নাম রেখেছেন ‘চতুল’। পাহাড়ী বৌদ্ধ যারা মূলতঃ চেহারা এবং আকৃতিতে মঙ্গোলিয়ান নৃগোষ্ঠীভুক্ত তারা নাম রেখেছেন ‘চাতং গং’। উর্দুভাষী কবির চাটগাম, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ‘চট্টলা’। কোন কোন ইতিবৃত্তিকারের মতে ‘সাতগ্রাম’ বা ‘সপ্তগ্রাম’। মুসলমানদের নিকট সুপরিচিত চাটিগাম থেকে চট্টগ্রাম। আর বেনিয়া ইংরেজদের দেয়া নাম চিটাগাং। জনশ্রুতি আছে যে, এ ভূখণ্ডে এক সময় জ্বিন পরী ও দৈত্যের অবাধ বিচরণ ও আধিপত্য ছিল। চট্টগ্রাম মহানগরীর কোর্ট বিল্ডিং পাহাড় ‘পরীর পাহাড়’ নামে এক সময় পরিচিত ছিল। চট্টগ্রামের লোকসমাজে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, চেরাগী পাহাড়ে বাতি জ্বালিয়ে হযরত শাহ বদর আউলিয়া জ্বিনপরী, দৈত্যদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। চাটি তথা চেরাগের (বাতি) আলোতে জ্বিনপরীদের টিকে থাকা সম্ভব না হওয়ায় তা মনুষ্য বসবাসের যোগ্য স্থান হয়ে ওঠে। আউলিয়ার জ্বালানো বাতিতে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ায় অত্র এলাকার নাম চাটিগাম হিসেবে পরিচিতি পায়। মূলতঃ আধ্যাত্মিক অভিধান অনুযায়ী চাটিগাম হচ্ছে আধুনিক চট্টগ্রাম।

নামের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানের অভিন্ন চিত্র সকলের বর্ণনায় একক সূত্রে গ্রথিত থেকেছে। আহাদিসুল খাওয়ানিন (চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস) এর লেখক মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর উল্লেখ করেন, “পুরানো নিদর্শনাদি হতে প্রতিপন্ন হয় এ সময় পার্বত্য অঞ্চলে বাস করত কতিপয় অসভ্য জাতি, তুর্ক ও হযরত নূহের (আঃ) তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস এর বংশধর।” ইতিহাসে এরা ইয়াফেসি গোত্রীয়

জনগণ হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আঃ) এর তিনপুত্র ছিলেন হাম, সাম এবং ইয়াফেস। মহা প্লাবনের পর হাম, সাম ও ইয়াফেসের বংশধরগণ তাদের স্ব স্ব বংশের লোকজন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত নূহের (আঃ) তিন পুত্রের নামে পৃথিবীর বুকে তিনটি মানবগোষ্ঠীর বিস্তৃতি ও বিকাশ দেখা যায়। নৃ-বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জনগোষ্ঠী পরিচিতিতে হামের বংশধর হেমিটিক, সামের বংশধর সেমেটিক এবং ইয়াফেসের বংশধর ইয়াফেসি নামে বিভিন্ন বিবরণী আছে। ইয়াফেসিরা মঙ্গোলীয় হিসেবে পরিচিত। ইয়াফেস বংশীয় লোকদের গায়ের রং প্রধানত হলুদ ও গমের মতো। প্রাচীন ইতিহাসে এ জনগোষ্ঠী ধর্ম বিবর্জিত, উচ্ছৃঙ্খল এবং মানুষ খেকো রাক্ষস হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। সম্ভবত এদের আদি গোত্রসমূহ নরমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল।

আদিম অরণ্য জীবনে অভ্যস্ত মগ, জুমিয়া, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাওতাল, খীসা, মরং প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর মানুষ চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় বসবাস করত। এদের আচার অভ্যাস সমতল ভূমির মানুষের মতো রুচিসম্মত এবং শালীন ছিলনা। আদিমতাতে অভ্যস্ত থাকায় এদের লজ্জা শরম সম্পর্কে ধারণা ছিল না। এক সময় ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ সবাই উলংগ থাকতো। পোশাক পরিচ্ছদকে তারা অপ্রয়োজনীয় বোঝা মনে করতো। খাদ্যবস্তু গ্রহণে তারা সাপ, গুই সাপ, পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গ নির্বিচারে ভক্ষণ করত। কঠোর পরিশ্রমী এবং নির্ভর্য জীবনচা্রে অভ্যস্ত এ সকল মানুষ টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে জায়গা জমি বন্ধক দিত। স্থানীয় বিত্তবান চতুর এবং কপট মহাজনরা সাধারণ পার্বত্যবাসীর জমি বন্ধক রাখতো। খাতককে মহাজনের বাড়ীতে থেকে ভূতের কাজ করতে হতো। মহাজন বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া চলতো। তবে মেয়ে লোক খাতক হলে মহাজন বাড়ীতে ভৃত্যবৃত্তির পাশাপাশি মহাজনের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাম-লালসা পূর্ণ করতে হতো। এ ধরনের যৌনাচারে সন্তান জন্ম হলে তা ঋণ গ্রহীতার সন্তান হিসেবে ঘোষিত হতো। মহাজন এ ধরনের সন্তানের দায়িত্ব নিতো না। এ রূপ অনাচার এবং বীভৎস রীতি নীতির নরগোষ্ঠী পাহাড়ি মানুষের মধ্যে কোন প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল না। তবে এরা নিজেদের মধ্যে সহজাত সততা-সরলতা পালন করতো। কুটিলতা, কপটতা, ঠগবাজি তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে হতো না। আদিম অরণ্যচারীদের মতো বৃক্ষ, পাথর, নদী প্রভৃতির উপাসনা এরা করতো। এদের মধ্যে বিয়ে প্রথা প্রচলিত ছিল না। তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো সঙ্গীনি নির্বাচন করতো। আদিম সমাজ হওয়ায় সেখানে সর্দার প্রথা বলবত ছিল। সর্দারের মতামত সবাই মেনে নিত। অসভ্য বর্বর মগদের আধিপত্যের কারণে এখানে মগদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক সময় মগরা অরণ্যচারী লোকদের মাধ্যমে মানুষ শিকার করতো। বীভৎসভাবে নিহত

মানুষের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সর্দারের জন্য উপটোকন হিসেবে পাঠানো হতো। মগদের শাসন ছিল “জোর যার মুল্লুক তার” নীতি ভিত্তিক। জড়বাদী জনগোষ্ঠী হওয়ায় এদের অন্যায়, অবিচার, অপরাধ কর্ম সম্পর্কে কোন প্রকার ভয়ভীতি, বিচার-আচার ছিল না। ঐতিহাসিক ভ্যান লি ছোটেন মগ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিবরণী দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, “জলদস্যুরা ছিল বন্য জন্তুর মতো বর্বর।” এন এম হাবিব উল্লাহ রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস পুস্তকে মগদের বর্বরতার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, “মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে ঘন জনবসতিপূর্ণ বাংলার উপকূল জনশূন্য হয়ে পড়েছিল।” ইতিহাসবিদ শিহাব উদ্দিন তালিশ মগদস্যুদের অত্যাচারের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, “মেঘনা নদীর মোহনা থেকে অববাহিকা উর্ধ্বদেশে প্রবেশ করে মগদস্যুরা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে দিত। গৃহপালিত পশু পাখিও এদের বর্বরতা থেকে রেহাই পেতনা।” মিয়ানমার চীন পর্বত থেকে নিয়ে তাশন পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চল-পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় মগদের হিংস্র দাঙ্গা হাঙ্গামার শিকার হয়ে বোমাং, চাকমা, মারমা প্রভৃতি জনগোষ্ঠী জীবন রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। মগদের অত্যাচারের ফলে অত্র অঞ্চলকে ঘিরে লোকালয়ে সৃষ্টি হয় “মগের মুল্লুক” প্রবাদ বাক্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কিয়দংশ এবং কক্সবাজারের সীমান্ত জুড়ে রয়েছে বার্মা তথা মিয়ানমারের অবস্থান। মিয়ানমারের একটি প্রদেশ আরাকানের বর্তমান নাম রাখাইন। এরা মূলতঃ মগ। এক সময় এরা ‘মা’ ব্যতীত আপন বোনকেও বিয়ে করতো। মগদের দাপট এবং বর্বরতার মুখে এক সময় চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদের শাসকরা আরাকান রাজাকে কর দিত। এদের ভাষা চীনা ভাষা না হলেও তা ছিল চীনা ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। চীনা ভাষায় প্রতিটি শব্দ এক সিলেবল দ্বারা গঠিত। বর্মী ভাষাও একই রূপ। চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনপদের পাহাড়ী মানুষদের ভাষার ধরনও একই প্রকৃতির। চীন, বার্মা, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ একই নরগোষ্ঠীভুক্ত অর্থাৎ ইয়াসেফিয় (মঙ্গোলীয়)। এ মগরা পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে মিলে সাগরে দস্যুবৃত্তি করতো। এদের সম্পর্কে সপ্তদশ শতাব্দীতে বংশীদাশ রচিত মনসা মঙ্গলে উল্লেখ আছে, “মগ ফিলিজি যত, বন্দুক পালিতা হাত। একেবারে দশগুলি ছোটো।” ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী জানা যায় এক সময় মগরা চট্টগ্রাম শাসন করেছে। চট্টগ্রামে মগী সন তারিখ বলবত ছিল। অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে পাহাড়ে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় তাদের শাসনামলের (মগী অহম জনগোষ্ঠীর) তাম্রমূদা পেয়েছেন বলে বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

চট্টগ্রামের আরেকটি অতিপরিচিত এলাকা হচ্ছে সীতাকুণ্ড।

লোককথা অনুযায়ী জানা যায় ভারতের অযোধ্যা রাজা রামচন্দ্র (দশরথ পুত্র) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি। রামচন্দ্র বনবাসে প্রেরিত হলে তিনি স্ত্রী সীতাসহ শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে যান। মূলতঃ মুনির নির্দেশে শ্রী রাম চন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে আগমন করেন এবং এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। এ কারণে চট্টগ্রামের এই এলাকা সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে ওঠার সময় ডান পাশে চিহ্নিত স্থানটি 'রাম কুণ্ড' নামে অভিহিত। এ ধরনের অসংখ্য প্রাচীন উপাখ্যান ও ঘটনাপঞ্জী সমৃদ্ধ চট্টগ্রামে মানবগোষ্ঠীর হেদায়তের পথ প্রদর্শনের প্রয়োজনে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে আবির্ভাব ঘটে খাতেমুল অলদ হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের।

চট্টগ্রামের ভূ প্রকৃতির অনন্য আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমুদ্র পাড়ে প্রাকৃতিক বন্দরের অবস্থিতি। এ বন্দর যেন প্রাচ্য প্রতীচ্যের মানব সম্পর্ক ও সংযোগের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা। বহু দেশ বহু জাতির মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য এবং দেশ ভ্রমণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে প্রাচ্যে এসেছেন। এদের মধ্যে অনেকে অর্থ, কড়ি, বৈষয়িক সম্পদ এবং সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে যেমন এসেছেন, তেমনি এখানকার জীবনধারা, মানুষের বিশ্বাস, ধর্ম, কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হবার জন্যে অনেকে এসেছেন। সমুদ্র পথে দুর্বৃত্ত দমনের একটি ঘটনা মহানবী (দঃ) এর নির্দেশে সংঘটিত হবার তথ্য ইতিহাসে সন্নিবেশিত হতে দেখা যায়। এরূপ ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)। মহানবীর (দঃ) নির্দেশে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে তার অভিযান এবং দীর্ঘ সময় সমুদ্রে অবস্থান এ বিষয় নিশ্চিত করে যে আরব সাগর ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত নিয়ে কেউ কেউ হয়তো বঙ্গোপসাগরেও প্রবেশ করেছিলেন। কারণ দীর্ঘ সময় সমুদ্রে নৌযান নিয়ে অবস্থানের কারণে স্বাভাবিক খাদ্য ফুরিয়ে গেলে হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) কে গুটকী খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। সাহাবা কেরামদের মিশন ছিল তাওহীদের। তাঁদের সঙ্গী সাথীদের কেউ কেউ সমুদ্র উপকূলে ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। এ ধরনের যাতায়াতের অন্যতম একটি স্থান চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। সাহাবা কেরামদের আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত বলা না গেলেও এটি সত্য যে তাওহীদের বাণী নিয়ে অনেক পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব চট্টগ্রাম বন্দর স্পর্শ করে গেছেন। তাঁদের একজন আরাকানের রোসাঙ্গ এলাকায় সমাধিস্থ আছেন। জনশ্রুতি আছে যে, মহানবী (দঃ) এর দুনিয়াতে অবস্থানকালে আশারা মোবাম্বা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াহ্বাস (রাঃ) এবং হযরত সাঈদ বিন যাইদ (রাঃ) চীন যাবার পথে চট্টগ্রাম অবতরণ করে ছিলেন। চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতির মতো এর গণ মানসেও স্বতন্ত্র ধারা বিরাজমান। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে খাল, বিল, নদী, গাছ গাছালির সমারোহ থাকায় বিচিত্র

লোকাচার ও নান্দনিকতাপূর্ণ চট্টগ্রামের মানুষের মধ্যে যে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের মননশীল দিকগুলো গ্রহণ ও আত্মস্থ করার প্রবণতা অত্যধিক। এ কারণে চট্টগ্রামের লোকাচার, জনসংস্কৃতি, আঞ্চলিক ভাষা এবং স্বভাব চরিত্রে বিভিন্ন জনমানসের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

অধিকাংশ ইতিহাস বেত্তা এবং বংশ পরিচয় থেকে জানা যায় হিন্দুরা হযরত নূহের (আঃ) পুত্র হামের উত্তর পুরুষ। ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে এরা ভারতে প্রবেশ করেন। বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থে জনাব আবদুস সাত্তার প্রণীত নতুন ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী দেখা যায় খ্রিস্টীয় ৩৭৭ সনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমুদ্র গুপ্তের আমলে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি সভ্যতার প্রসার ঘটতে থাকে। কালক্রমে পৌত্তলিকতা বাংলা ভূখণ্ডের বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রূপ নেয়। এক পর্যায়ে বর্ণ হিন্দুদের প্রভাব এবং অচ্ছুৎ প্রথার দাপটে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ভাটির দিকে পুনর্বাসিত হতে থাকে। কিন্তু বর্ণাশ্রমের অপঘাতে বৌদ্ধরা সমতল ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে পাহাড়ি এলাকায় নতুন বসতির সন্ধানে এগুতে থাকে। বর্ণবাদীরা ধর্মাচারে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মোটেই সহনশীল ছিল না। ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে স্বদেশ স্বভূমি ত্যাগ করতে হতো অনেকাংশে বাধ্য হয়ে। বর্ণ ধর্মবাদীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বৌদ্ধরা পূর্ব এশিয়ার দিকে ধাবিত হলে এ অঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।

এদিকে উত্তর বাংলায় সামন্ত চক্রের বিদ্রোহের কারণে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশের অবসান ঘটে এবং কর্ণাটকের ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেন বংশের নৃপতি হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন বাংলায় নতুন রাজ বংশের উদ্ভব ঘটান। বিজয় সেন ১০৯৮ থেকে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৬২ বছর রাজত্ব করেন। দীর্ঘকালীন শাসন পরিচালনার কারণে তিনি সার্বভৌম রাজা হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। বাহুবল এবং কৌশলের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করায় বিজয় সেন পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহা রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে অধিরাজ বৃশভঙ্কর গৌরব সূচক পরিচিতি গ্রহণ করেন। বিজয় সেনের পর তার পুত্র বল্লাল সেন মাত্র ১২ বৎসর রাজত্ব করেন। বল্লাল সেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন বাংলার রাজা হন। তাঁর ৮০ বছর বয়সকালে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম অভিযাত্রী সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী নদীয়া আক্রমণ করেন। এ সময় লক্ষণ সেন কোন প্রকার প্রতিরোধ ব্যতিরেকে নদী পথে দক্ষিণ বাংলায় চলে আসেন। এদিকে গৌড়কে কেন্দ্র করে বখতিয়ার খিলজী উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে গৌড়কে ভিত্তি করে আধ্যাত্মিক সাধকদের নির্বিলাস জীবন ধারার আলোকে মুসলিম সভ্যতা, কৃষ্টি সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে ওঠে। (চলবে)

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর কেরামত বিষয়ক তথ্য উপাত্ত

• আলোকধারা ডেস্ক •

বাবা ভাণ্ডারীর কেরামত: হযরত বাবা ভাণ্ডারীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কেরামতের ঘটনা, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশেক ভক্ত ও সংশ্লিষ্ট মহলের মুখে মুখেই উচ্চারিত। এর থেকে মাত্র ৫৪টি কেরামত তাঁর জীবনীগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূলগ্রন্থে কেরামতের যে বর্ণনা-পদ্ধতি তা অনেক ক্ষেত্রে অপরিপক্বিত। সাধারণভাবে আলোচনার সুবিধা, বিশেষত ভবিষ্যৎ গবেষণার তথ্যসূত্রের কথা বিবেচনায় রেখে আমরা কেরামতগুলোকে নিম্নোক্ত ১৬টি শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছি-

১. প্রকৃতির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব- (কেরামত সংখ্যা-১০)
২. বন্যপ্রাণীর উপর প্রভাব- (কেরামত সংখ্যা-৯)
৩. হস্তনিঃসৃত পানির বরকতে রোগ মুক্তি- (কেরামত সংখ্যা-৯)
৪. তাঁর গায়েবি নির্দেশ পেয়ে আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক- (কেরামত সংখ্যা-৬)
৫. তাঁর বেলায়তি ক্ষমতায় মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চারণ- (কেরামত সংখ্যা-২)
৬. স্বপ্ন ও এলহামযোগে দরবারে তাঁর কাছে আসার নির্দেশ- (কেরামত সংখ্যা-২)
৭. আধ্যাত্মিক ফয়েজ রহমত প্রদান - (কেরামত সংখ্যা-২)
৮. অদৃশ্য সুফি-দরবেশগণের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক- (কেরামত সংখ্যা-২)
৯. তাঁর বেলায়তি ক্ষমতায় খুনের আসামীর বেকসুর খালাস- (কেরামত সংখ্যা-২)
১০. জার্মানীর আসন্ন বোমা বর্ষণের হাত থেকে রক্ষা- (কেরামত সংখ্যা-১)
১১. বেলায়তি ক্ষমতায় তামা স্বর্ণে পরিণত- (কেরামত সংখ্যা-১)
১২. তাঁর কৃপায় বিপুল অর্থ উপার্জন- (কেরামত সংখ্যা-১)
১৩. তাঁর বেলায়তি ক্ষমতায় সমুদ্র-ডুবি থেকে ভক্ত উদ্ধার- (কেরামত সংখ্যা-১)
১৪. জ্বিন-পরীর উপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব- (কেরামত সংখ্যা-১)
১৫. তাঁর উসিলায় মাইজভাণ্ডার বিরোধী বাহাসকারীদের পলায়ন- (কেরামত সংখ্যা-২)
১৬. প্রতীকী কেরামত- (কেরামত সংখ্যা-৩)

কেরামতের শ্রেণী বিভাগ ও বিচার বিশ্লেষণ (কেরামতের সংখ্যা-৫৪)

১. প্রকৃতির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব (কেরামত সংখ্যা-১০)

কুশাসনে বসে হালদা নদীর পানিতে ভ্রমণ অল্প সময়ে অবিশ্বাস্যরকম দীর্ঘপথ অতিক্রম
মানুষের মধ্যে থেকেও মাঝে মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া
রাতের অন্ধকারে হাঁটার সময় আলো পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকা গহীন অরণ্যে হাঁটার সময় আশ্চর্যরকম ভাবে পথ তৈরি হয়ে যাওয়া পাহাড়ে ওঠার দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথ অল্প সময়ে অতিক্রম

রেল লাইনের উপর বসে থেকে আসন্ন দুর্ঘটনা থেকে রেহাই প্রদান একই সময়ে একাধিক স্থানে অবস্থান ও দর্শন দান
ওফাতের পর প্রত্যক্ষভাবে আজমীর শরিফে দর্শন দান
তাঁর স্মরণে অলৌকিকভাবে আগুনের লেলিহান শিখা রোধ।

২. বন্য প্রাণীর উপর বাবা ভাণ্ডারীর প্রভাব (কেরামত সংখ্যা-৯)

তাঁর থেকে প্রাপ্ত গায়েবি কালাম উচ্চারণে বন্য হনুমানের সেজদায় অবনত
তাঁর ওয়াসিলায় নেকড়ে বাঘের শিকারের মধ্যে পড়েও নিরাপদে অবস্থান
তাঁকে দেখে জংলী রাম কুকুরের পলায়ন
হিংস্র বনের - বাঘ কর্তৃক বাবা ভাণ্ডারীকে সেজদা সাপের ফণা বিস্তার করে বাবা ভাণ্ডারীকে ছায়া দান
তাঁর নির্দেশে ছোবল মারতে উদ্ধত কালনাগিনীর মাথা অবনত ও পলায়ন
তাঁর ইশারায় গরু অন্যের ক্ষেত নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা।

৩. তাঁর পানির ওয়াসিলায় রোগ মুক্তি (কেরামত সংখ্যা-৯)

হস্তনিঃসৃত পানির বরকতে সিফিলিস রোগ নিরাময়
হস্তনিঃসৃত পানির বরকতে মৃগীরোগ উপশম
তাঁর নির্দেশে ডাক্তার-নিষিদ্ধ বকরি মাংস খেয়ে কালাজ্বর ও টাইফয়েড রোগ থেকে মুক্ত
হস্তনিঃসৃত পানির বরকতে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত-সুস্থ জীবন লাভ
তাঁর থু থু নিক্ষেপে গরমী রোগ থেকে নিরাময়
তাঁর দরবারে খেদমত করার ওয়াসিলায় বোবা ছেলে সুস্থ।
তাঁর রওজা শরিফের পানি খেয়ে মুমূর্ষু রোগীর আরোগ্য লাভ
স্বপ্নে দর্শন দানে রোগীর মাথার উপর হাত বুলিয়ে রোগের উপশম।

৪. তাঁর গায়েবি নির্দেশ পেয়ে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক (কেরামত সংখ্যা-৬)

তাঁর গায়েবি নির্দেশ পেয়ে সাইকেল দ্বারা বাঘের উপর আক্রমণ - নিরাপদে ভক্ত উদ্ধার।

তাঁর গায়েবি সতর্কবাণীতে কালনাগিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা
তাঁর গায়েবি সতর্কবাণীতে আততায়ীর ছুরিকাঘাত থেকে রক্ষা
তাঁর গায়েবি সতর্কবাণীতে জার্মানবাহিনীর আসন্ন বোমা
বর্ষণের হাত থেকে রক্ষা, সড়ক দুর্ঘটনায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত
থেকে রক্ষার পূর্বাভাস এবং নতুন জীবন দান। ১৯৪৭ সালে
মাদ্রাজ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চট্টগ্রাম চলে আসার পূর্বাভাস।

৫. তাঁর বেলায়তি ক্ষমতায় মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার
(কেরামত সংখ্যা-২)

তাঁর হস্ত হস্তনিঃসৃত পানির বদৌলতে মৃত খাদেম হেদায়েত
আলীর পুনঃ জীবন লাভ
তাঁর গায়েবি নির্দেশ পেয়ে ৩৬ ঘণ্টা পানি ঢেলে মৃতব্যক্তির
নতুন জীবন লাভ।

৬. স্বপ্ন ও এলহামযোগে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে বাবা
ভাণ্ডারীর কাছে আসার নির্দেশ (কেরামত সংখ্যা-২)

ভারতের উত্তর প্রদেশে মোরাকাবায় বসে এলহামযোগে বাবা
ভাণ্ডারীর ছোহবতে আসার নির্দেশ।
আজমীর শরিফে স্বপ্নযোগে খাজা বাবার নির্দেশ পেয়ে বাবা
ভাণ্ডারীর কাছে এসে ফয়েজ রহমত অর্জন।

৭. বাবা ভাণ্ডারী কর্তৃক আধ্যাত্মিক ফয়েজ রহমত প্রদান
(কেরামত সংখ্যা-২)

মোমবাতি প্রদানের মাধ্যমে বেলায়তি জ্যোতি প্রকাশের
ক্ষমতা প্রদান
কৃষক শুরুর আলীকে খাদ্যের মাধ্যমে ফয়েজ-রহমত প্রদান।

৮. অদৃশ্য সুফি দরবেশদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক
(কেরামত সংখ্যা-২)

অবোধ্য ভাষাভাষী সাদা পোশাকধারী আউলিয়াদের বাবা
ভাণ্ডারীকে অভিবাদন (বাবা ভাণ্ডারীর ভাষায় এঁরা খোদার
লস্কর)
গভীর রাতে মসজিদে সুফি-দরবেশদের সাথে মিলন এবং
নামাযের ইমামতি।

৯. জার্মানির বোমা বর্ষণ থেকে রক্ষা (কেরামত সংখ্যা-১)

দ্রৈশ্য থেকে হাতে ধরে তুলে নিয়ে ভক্তকে জার্মান বাহিনীর
বোমা বর্ষণ থেকে রক্ষা

১০. তাঁর বেলায়তি ক্ষমতায় তামাকে স্বর্ণে পরিণত
(কেরামত সংখ্যা-১)

বাবা ভাণ্ডারীর হুকুমে গাছের পাতা দিয়ে তামা কে স্বর্ণে
পরিণত

১১. তাঁর কৃপায় বিপুল অর্থ উপার্জন (কেরামত সংখ্যা-১)

তাঁর নির্দেশে রেঙ্গুন (মায়ানমার) গমন, অপ্রত্যাশিত অর্থ
উপার্জন

১২. তাঁর বেলায়তি ক্ষমতায় সমুদ্র ডুব থেকে ভক্ত উদ্ধার
(কেরামত সংখ্যা-১)

সমুদ্রে সাম্পান ডুব থেকে নিজহাতে ভক্ত উদ্ধার

১৩. জ্বীন-পরীর উপর তাঁর প্রভাব (কেরামত সংখ্যা-১)

তাঁর নির্দেশে দুই জ্বীন বশীভূত এবং কলেমা পাঠ।

১৪. মাইজভাণ্ডারের বিরুদ্ধে বাহাস [বিতর্ক] কারীদের পলায়ন
(কেরামত সংখ্যা-১)

মাইজভাণ্ডার প্রশ্নে বাহাস করতে এসে গ্রাম শুদ্ধ উপস্থিত
সকলের মধ্যে ব্যাপক অজ্ঞ (আধ্যাত্মিক ভাব বিভোর নৃত্য)
প্রবণতা, ভয়ে বাহাসকারীদের পলায়ন। মাইজভাণ্ডারী সামা
মাহফিলে আক্রমণকারীর নিজেদের লাঠিতে নিজেরা আহত
ও পলায়ন।

১৫. প্রতীকী কেরামত (কেরামত সংখ্যা-৩)

শাড়িকাপড় পরে, পুকুর থেকে কলসি ভর্তি করে ঘরের কোণে
রেখে দিয়ে কন্যা পক্ষকে বিয়েতে সম্মতকরণ।
তাঁর নাম স্মরণে দাঙ্গার সময় অলৌকিকভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর
হাত থেকে রক্ষা।

তাঁর রওজা শরিফে ফরিয়াদ করে পুত্র সন্তান লাভ।

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কেরামতের
বর্ণনা

১. তাঁর হস্তনিঃসৃত পানিতে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার

২. তাঁর গায়েবি সতর্কবাণী শুনে জার্মান বাহিনীর বোমার
হামলা থেকে উদ্ধার

৩. ঝড়ে সমুদ্রে সাম্পান ডুবির সময় দরবারে বসে নিজ হাতে
ভক্ত উদ্ধার

৪. তামাকে স্বর্ণে পরিণত

১. হস্তনিঃসৃত পানিতে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর অজস্র কেরামতের মধ্যে সবিশেষ
উল্লেখযোগ্য তাঁর হস্তনিঃসৃত পানি। তাঁর কেরামত সম্পর্কিত
আলোচনায় হস্তনিঃসৃত পানির বিষয়টিই সর্বাধিক পরিচিত ও
প্রচারিত। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে এই
হস্তনিঃসৃত পানি রীতিমত মহৌষধের মতো কাজ করত।
আধ্যাত্মিক ফয়েজ দান থেকে মৃতকে জীবিত করার অনেক
ঘটনার রহস্য নিহিত এই হস্তনিঃসৃত পানিতে। এই রকম
একটি ঘটনা:

একদা প্রত্যুষে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর জালালিহাল প্রকাশ

পায়, তাঁর মুখমণ্ডল জবা ফুলের মতো রঙিন বর্ণ ধারণ করে। কর্ণের আওয়াজে সবাই থর থর করে কম্পমান। এমতাবস্থায় তাঁকে কিছুটা শান্ত করার মানসে খাদেম হেদায়ত আলী যথারীতি তামাক সাজিয়ে বিনীতভাবে সামনে পেশ করার সাথে সাথে জজবিয়াত হালতে একখানা দাও নিয়ে খাদেমকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেন, ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এতদর্শনে সকলে হতচকিত এবং উৎকর্ষিত। সকলে মিলে বাবা ভাণ্ডারীকে অনুরোধ করলেন এর একটা বিহিত করতে। তিনি তখন স্বীয় হস্ত মোবারকের উপর পানি ঢালতে লাগলেন আর এই পানি হেদায়েত আলীর মৃতদেহের উপর পড়তে থাকে। এভাবে কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চারণ হয়, হেদায়ত আলী সুস্থ হয়ে উঠেন। অতঃপর হেদায়ত আলী আরো আট বছর তাঁর খেদমত করেন।

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর হস্তনিঃসৃত পানির সবিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছিল শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর শিশু অবস্থার ঘটনার মধ্যে। মাত্র একুশ দিনের শিশু জিয়াউল হক মাতুরোগে মৃতপ্রায়। সংশ্লিষ্ট সবাই উদ্ভিগ্ন। মহিলা মহলে রীতিমতো আহাজারী। এমতাবস্থায় মৃত-প্রায় শিশুকে নিয়ে আসা হয় হযরত বাবা ভাণ্ডারীর ছজরা শরিফে। তিনি মুখের চাদর সরিয়ে পানি ঢালার জন্যে পবিত্র হাত প্রসারিত করে দেন। শিশুকে জলের ধারায় রেখে অনবরত সাত কলসি পানি ঢালার পর ইশারা করলেন পানি বন্ধ করতে। তখনও শিশুর দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। সবাই রীতিমত উৎকর্ষিত। অবশেষে হযরত বাবা ভাণ্ডারী তাঁর হাত নিংড়ে দু তিন ফোটা পানি দিলেন শিশুর চোখে মুখে। আস্তে আস্তে শিশু চোখ মেলে তাকাল-সুস্থ হয়ে উঠল। শুধু তদীয় হস্তনিঃসৃত পানি নয়, তাঁর বেলায়তি ক্ষমতায় তদীয় নির্দেশে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ‘বাঘের মুখে লোটা কেরামতকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল কবিতা। আর বাবা ভাণ্ডারীর হস্তনিঃসৃত পানির ফজিলতের কথা বর্ণনা করে রচিত হয়েছিল গান- ‘গজলে রায়হান’। অন্যরাও তাঁর স্মরণে পানি ঢেলে মৃত ভক্তের জীবন লাভে সমর্থ হয়েছিল। এ রকম একটি ঘটনার বর্ণনা- ১৯২৮ সালের ঘটনা : চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার জাংগলপাড়া নিবাসী ছালে আহমদ মাষ্টারের পিতা মোঃ ইসমাইল সাধারণ জুরে ভোগে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তদীয় মাতা কেঁদে অস্থির। এমতাবস্থায় শুনতে পেলেন হযরত বাবা ভাণ্ডারীর গায়েবী নির্দেশ-ইসমাইলকে পর্দার আড়ালে রেখে পানি ঢালতে থাক।’ হযরত বাবা ভাণ্ডারীর গায়েবী নির্দেশ পেয়ে মৃত ইসমাইলকে যথারীতি পানি ঢালা আরম্ভ হয়। বিরামহীন ভাবে ৩৬ ঘণ্টা পানি ঢালার পর মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চারণ ঘটে। এ ঘটনার পর ইসমাইল সাহেব আরও ১১ বৎসর জীবিত ছিলেন। বলাবাহুল্য, তিনি ছিলেন হযরত বাবা ভাণ্ডারীর

একজন একনিষ্ঠ ভক্ত।

২. তাঁর গায়েবি সতর্কবাণী পেয়ে জার্মানবাহিনীর বোমা হামলা থেকে ভক্ত উদ্ধার

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার [বর্তমান পটিয়া] কোলাগাঁও নিবাসী ফকির আলী আহমদ মিস্ত্রী বলেন- আমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীতে যোগদান করে বসরা যাই। একদিন দুপুরে বসরা খাড়িতে জাহাজ নোঙর করেছি, এমন সময় হযরত বাবা ভাণ্ডারী গায়েবী আওয়াজে বললেন, “আলী আহমদ কুলে উঠে খেজুর বাগানে ঢুকে পড়।” কাল বিলম্ব না করে খেজুর বাগানে ঢুকে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জার্মানীর বোমা হামলায় আমাদের জাহাজটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

৩. ঝড়ে সমুদ্রে সাম্পান ডুবির সময় মাইজভাণ্ডারে থেকে নিজ হাতে উদ্ধার

চট্টগ্রামের মহেশখালী থানার অন্তর্গত মাতার বাড়ি গ্রামের নজির আহমদ সিকদারের বর্ণনা- আমি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকারকে ধান সরবরাহ করতাম। একখানা বড় সাম্পান বোঝাই করে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার পর কুতুবদিয়ার কিছু পরে ঝড়ের কবলে পড়ি। চোখের সামনে ধান- বোঝাই সাম্পান জলে নিমজ্জিত হয়ে গেল। আমি অথৈজলে হাবুডুবু খেতে খেতে মৃত্যু পূর্বমুহূর্তে একান্তভাবে হযরত বাবা ভাণ্ডারীকে স্মরণ করি। তাঁকে স্মরণের সাথে সাথে লক্ষ্য করলাম স্বয়ং বাবা ভাণ্ডারী আমার ডান হাত ধরে সজোরে টেনে তীরে নিয়ে আসছেন। তীরে পৌঁছাবার সাথে সাথে হযরত বাবা ভাণ্ডারী অদৃশ্য হয়ে যান।

৪. তামাকে স্বর্ণে পরিণত

পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ শেষে বাবা ভাণ্ডারী কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ কুলে দেয়াঙ পাহাড়ে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। এ সময় বড় উঠানের কাজি মৌলভী মনির আহম্মদ খাঁ কিমিয়াগিরদের (স্বর্ণ প্রস্তুতকারীদের) ফাঁদে পড়ে বহু টাকা পয়সা নষ্ট করে প্রায় সর্বশান্ত হয়ে পড়েন। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর আগমন সংবাদ শুনে তিনি তাঁর কাছে গিয়ে স্বর্ণ প্রস্তুত বিদ্যা শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন। তার একান্ত অনুরোধে একদিন হযরত বাবা ভাণ্ডারী একটি গাছ থেকে কিছু পাতা নিয়ে তাকে বললেন, ‘তামা গরম করে তার উপর এ পাতার রস ঢেলে দাও, স্বর্ণ হয়ে যাবে।’ মনির সাহেব যথারীতি তাই করলেন। চোখের সামনেই খাঁটি স্বর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেল। বলাবাহুল্য, এর পরে মনির আহমদ ঐ গাছের পাতা নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কোনো ফল পায় নি। আসলে গাছের পাতা নয়; বাবা ভাণ্ডারীর হুকুমেই তামা স্বর্ণে পরিণত হয়েছিল। গাছের পাতা ছিল উপলক্ষ মাত্র।

শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী সম্পর্কে সমকালীন বিশিষ্টজনদের অভিমত

• ড. সেলিম জাহাঙ্গীর •

১ মানব প্রেম, সামাজিক কল্যাণ ও আত্মিক সমৃদ্ধিতে মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফ এর সাধক হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর পবিত্র জীবন ও চরিত্রমাধুর্যে জাগতিক জীবনকে সুন্দর করার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি আল্লাহর নৈকট্যধন্য হয়ে শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসরণে জীবন গড়ার তাগিদ দিয়েছেন। এ দেশে ইসলামের মহান বাণী প্রচারে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অবদান তাই অনস্বীকার্য- আবদুর রহমান বিশ্বাস।^১

১. আবদুর রহমান বিশ্বাস, সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, বাংলা একাডেমী-ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২১৯

২ আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে মানবতার জয়গানে মুখরিত, ধর্ম-সাম্যের বক্তব্য নিয়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল ধর্মের অপূর্ব মিলনকেন্দ্র হিসেবে বিগত শতাধিক বছর ধরে মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফ এক অনন্য সমন্বয়কারী ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। মানবপ্রেম, সামাজিক কল্যাণ ও আত্মিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফ এর ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফ এর মহান আধ্যাত্মিক প্রাণ-পুরুষ, বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্বীয় জীবনাচরণ, পবিত্র চারিত্রিক মহিমায় জাগতিক জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করার প্রেরণা দিয়েছেন। ১৯৮৮ সালে এক সফরের সময় একান্ত অনুরোধে তিনি আমার গুলশানের বাসায় উঠেন। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক সাহেব (সাবেক বন্যা নিয়ন্ত্রক ও পানি সম্পদ মন্ত্রী ১৯৯৬-২০০১) দোয়াপ্রার্থী হলে দুজনকে লক্ষ্য করে মৃদু হেসে বলেন, আপনারা দুজন তো এক জায়গার লোক। বললাম, আমরা দেশে এমন এক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী করেছি যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঠিক রাখাও সম্ভব হয় না। আত্মীয় উল্লেখে তিনি আমার মনকে এমন এক গভীর মমতায় ভরিয়ে তোলেন যে রূপ জীবনে আর কারো কাছ থেকে পাইনি। আমি গুনাহগার বান্দা, তিনি আমাকে বহু কিছু দিতে চাইলেও নিতে জানিনি।

-মিজানুর রহমান চৌধুরী।^২

২ মিজানুর রহমান চৌধুরী, রাজনীতিবিদ; সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২১৭ এবং শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ), জামাল আহমদ সিকদার, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম। ১১-স,

৩ আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মাওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) দীর্ঘ ছয় দশক ধরে কঠোর-কঠিন সংযম সাধনার মধ্যদিয়ে অগনিত মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর স্বীয় জীবনাচরণ ও পবিত্র

চারিত্রিক মহিমায় জাগতিক জীবনকেও সুন্দর ও মঙ্গলময় করার প্রেরণা দিয়েছেন। --বেগম খালেদা জিয়া।^৩

৩ বেগম খালেদা জিয়া, সাবেক প্রধানমন্ত্রী-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২২৫-২২৬

৪ মাইজভাণ্ডারী সাধনা যেমনি ইসলামের সৌন্দর্য ও ভিত্তিকে গণমুখী করেছে, তেমনি বাঙালী সংস্কৃতির ধারায় সংযোজিত করেছে একটি স্বতন্ত্র সাংগীতিক উজ্জীবনের। সঙ্গীতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ও পীরের স্বরণ মাইজভাণ্ডারী ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পময়তা- যা বাঙালি সংস্কৃতিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) একজন মহান আউলিয়া। তাঁর জীবন হলো নিরুপম কৃচ্ছতা ও অনুপম ত্যাগের, তাঁর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সৃষ্টির প্রতি অসীম ভালোবাসার তাগিদ। তাই তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য একটি হিরন্ময় প্রেরণা। -শেখ হাসিনা।^৪

৪ শেখ হাসিনা, সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ; সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২৩০

৫ কুশাসন, অবিচার, অবহেলায় ভূমন্ডলের এ অংশ অন্ধকারে নিপতিত ছিল তখন বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে অনেক অলিআল্লাহর আবির্ভাব ঘটেছে এই উপমহাদেশে সমাজসংস্কারক হিসেবে। এই নিরিখে হযরত শাহজালাল (রঃ), হযরত শাহপরান (রঃ), হযরত শরফুদ্দিন চিশতি (রঃ), শাহ আলী বোগদাদী (রঃ), শাহ মখদুম (রঃ), খানজাহান আলী (রঃ) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাইজভাণ্ডারের সাধক পুরুষ সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) সারাজীবন নিজেকে মানবকল্যাণে উৎসর্গ করে যে মহান আদর্শ রেখে গেছেন, তা অনুকরণীয় এক বিরল দৃষ্টান্ত - হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।^৫

৫ হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, সাবেক স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। মাসিক আলোকধারা, গাউসিয়া হক মন্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম, ১৯৯৭ইং সংখ্যা।

৬ কুরআন ও রাসুলে পাক (সাঃ) এর জীবনের আলোকে সর্বধর্মের সহাবস্থান বহাল রেখে মানবতার মুক্তিরপথ দেখাতে গাউসিয়তের কর্তৃত্বধারার মহান সাধকপুরুষ হযরত শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হতে শুরু করে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) যে দর্শন ঘোষণা করেছেন তা বিশ্ববাসীর উষ্ণস্বীকৃতি পাওয়ার দাবিদার বলে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। সমস্ত বিশ্বে এই দর্শনের ব্যাপক প্রচার-প্রকাশ ও প্রসার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। -এমাজউদ্দিন আহমদ।^৬

৬ অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২২২

৭ মাইজভাণ্ডার না গেলে মাইজভাণ্ডারের প্রকৃতিচিহ্ন উপলব্ধি করা কঠিন। এর ভেতর যে এত মানুষ নামায পড়ে, যিকির আযকার করে তা স্বচক্ষে না দেখলে উপলব্ধি করতে পারতামনা। সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখিনি। কিন্তু তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠানমালায় যোগদান করেছি তদীয়পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান এর বিশেষ আমন্ত্রণে। বয়সের প্রতি-তুলনায় সৈয়দ হাসানের ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁকে দেখেই তাঁর পিতা জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর চারিত্রিক মাধুর্য উপলব্ধি করেছি।- ডাঃ নুরুল ইসলাম।^৭

৭ জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য, ইউ-এস-টিসি। চেয়ারম্যান, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ওফাত শত বার্ষিকী জাতীয় কমিটি। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী: শতবর্ষের আলোকে, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, আঞ্জুমানে মোজাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম, ২০০৭

৮। শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর কাছে, এই মহান অধ্যাত্ম সাধকের কাছে সকল শ্রেণীর মানুষ যেত। যে যার মতোন আর্জি আবেদন পেশ করতেন। তিনি “আচ্ছা” বলে কিংবা হবার ইঙ্গিত দিয়ে অব্যাহত শুভাশিষ বিলাতেন। শহর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল; নিজে নিজেই অসংখ্য মানুষের কল্যাণ করে দিতেন। না চাইতেও বহু লোককে দয়া করেন, এমনকি বিরোধীদেরও। ফুলের গন্ধ ও সুন্দরের মতো সে ধারা অনন্তকাল ধরে চলবে। তাই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গতিশীল বিশ্বাসকে শাপলা ফুলের সৌন্দর্য সুসমায় রূপায়িত করেছি। আমার জানামতে, ‘শাপলা’ নির্মাণ-স্থাপত্যে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। শাপলার ভরা মৌসুম শরৎকালেই তিনি প্রেমাস্পদ প্রভু মিলনে এই ধরাধাম ত্যাগ করেন।-স্থপতি আলমগীর কবির।^৮

৮। শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, মোঃ মাহবুব উল আলম সম্পাদিত, মাইজভাণ্ডার একাডেমী, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫, পৃ. ১১৬। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলার আদলে শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করেছিলেন স্থপতি আলমগীর কবির। তাঁর মতে, নির্মাণ স্থাপত্যের ইতিহাসে শাপলার ব্যবহার এই প্রথম।

৯ মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মানবতা, সর্বজনীনতা এবং ধর্মসাম্যমূলক মতবাদ অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে, কারণ এই দর্শনের মূল কথাই হলো মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ। মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আবির্ভাবের পর থেকে বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) পর্যন্ত সকল সাধক পুরুষই এই কথাটিই ব্যক্ত করেছেন বিভিন্নভাবে। সমন্বয়ধর্মী, মানবতাবাদী এই দর্শন মানব সভ্যতার বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ডক্টর কামাল হোসেন।^৯

৯। ডক্টর কামাল হোসেন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ, সভাপতি গণফোরাম, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২২৩

১০ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ তথা শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সাথে আমার মনন ও আত্মার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী একজন উচ্চ মার্গের অলি। যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই কেবল তাঁর উচ্চমার্গের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। জীবনের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ তুচ্ছ করে অবিশ্বাস্যরকম কঠিন রেয়াজত বা সংযম সাধনের মাধ্যমে তিনি স্রষ্টার নৈকট্য (ফানাফিল্লাহ) লাভে সমর্থ হয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মহান অধ্যাত্মিক পুরুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান অনেকের কাছে আজও অবিদিত। দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে, শোষণ, নিপীড়ন-মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায়, দেশ গঠনে জাতি-ধর্ম-বর্ণগোত্র নির্বিশেষে সকলের সমান অংশ গ্রহণের যে উপকরণের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তা সময়ের পরীক্ষায় কালোত্তীর্ণ হয়ে থাকবে।- আব্দুর রাজ্জাক।^{১০}

১০ আব্দুর রাজ্জাক, রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন পানিসম্পদ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২১৯

১১ আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে মাইজভাণ্ডারশরিফ একটি প্রত্যয়দীপ্ত নাম। এই পাকদরবার খোদার অনুগ্রহ প্রত্যাশী ধর্মপ্রাণ মানুষের ভরসার ঠিকানা। বলতে দ্বিধা নেই, কালোত্তীর্ণ মহান প্রতিষ্ঠান মাইজভাণ্ডার শরিফের সাথে আমার রয়েছে বহু যুগের আত্মার আত্মীয়তা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অনেক স্বনামধন্য জাতীয় নেতাকে এই পবিত্র দরবারের সান্নিধ্যে আনতে আমি প্রয়াসী হয়েছি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সংকটকালে মাইজভাণ্ডার দর্শনের প্রাণপুরুষ শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ইশারা ইঙ্গিত এবং প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিলাভের যে সন্ধান দিয়েছেন তা আমাদের জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। অনেকের কাছে হয়তো অজানা যে, ১৯৭৫'র সেই কালো রাতে জাতির জনকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এই পীর সাহেবই সর্বপ্রথম একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় বড়ো মাপের কালো পতাকা উত্তোলন করেন, যা ১৫ই আগস্ট ৭৫ থেকে একটানা চল্লিশ দিন টাঙ্গানো ছিল। আমি মনে করি, জাতীয় শোকদিবসের এটাই ছিল সূচনাপর্ব-সর্বপ্রথম উদ্যোগ। ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সকলে এই দরবারে সমান। এটি এই দরবারের বৈশিষ্ট্য যা সাম্যবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমস্যাবিষ্ফুদ্ধ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মাইজভাণ্ডার দরবার যে সমাধানের পথ-নির্দেশ দিচ্ছে তা অনস্বীকার্য।- এম.এ. মান্নান।^{১১}

১১ এম.এ.মান্নান, সাবেক মন্ত্রী, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২২২

১২ মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অন্যতম মহান সাধক-পুরুষ শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী মানুষের নৈতিকতার কথা বলেছেন। মানুষকে আত্মশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন

ঈশারা-ইঙ্গিতে তাগিদ দিয়েছেন। টাকার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিলনা। লাখ লাখ টাকা তিনি আগুনে পুড়িয়েছেন। কঠোর সংযমী এ মহান সাধক একাধারে কয়েকদিন কিছু না খেয়ে থাকতে পারতেন। নামাজের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ ও তাগিদ। গরীব-দুঃখীদের অকাতরে টাকা বিলিয়ে দিতেন। স্বাভাবিক অবস্থায় আতিথেয়তায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। কোন অবস্থাতেই কাউকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রতিটি নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তিনি সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন।- ডক্টর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী।^{১২}

১২। ডক্টর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২১৮।
১৩ কল্যাণ ও শান্তির মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অমোঘবাণী আজ থেকে শতাধিক বছর ধরে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত আহমদউল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হতে শুরু করে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) মাধ্যমে হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) দার্শনিক পরিচর্যায় পুষ্ট হয়ে বিশ্বঅলি শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) সাধনায় পরিপূর্ণতায় রূপ পেয়েছে।- ডক্টর খোন্দকার মোশাররফ হোসেন।^{১৩}

১৩। ডক্টর খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, সাবেক মন্ত্রী, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২২৩

১৪ বিগত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, মাইজভাণ্ডারী দর্শনই পারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একই মঞ্চে অবস্থান করাতে। আমাদের দেশটার খুবই দুর্ভাগ্য, আল্লাহর এত অলি আউলিয়া আমাদের দেশে পদার্পনের পরও তাঁদের শিক্ষার প্রয়োগ না হওয়ায় আমাদের দেশের এই অবস্থা। সমাজ সংস্কারক হিসেবে শাহসুফি সৈয়দ আহমদউল্লাহ মাইজভাণ্ডারী এবং যার বহিঃপ্রকাশ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী এর জন্মদিনে এসে তা বুঝতে পারলাম।- অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ।^{১৪}

১৪ অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ, অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২৩৪

১৫ এই উপমহাদেশের ইসলামি অধ্যাত্ম জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মাইজভাণ্ডার দর্শনের প্রাণ-পুরুষ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। সমস্যাসংকুল সমাজের নিপীড়িত নিগৃহীত মানুষ এখনও মাইজভাণ্ডারের সুশীতল ছায়ায় এসে জীবনের অনেক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে। ধর্মীয় গোঁড়ামীর নিগড় ছিন্ন করে স্রষ্টার নৈকট্য লাভে মাইজভাণ্ডার - দর্শন যে আদর্শ স্থাপন করেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। আমার বিশ্বাস, মাইজভাণ্ডারের আদর্শ অনেককে সঠিক পথে চলার ইঙ্গিত দিতে সক্ষম।- সতীশ চন্দ্র রায়।^{১৫}

১৫ সতীশ চন্দ্র রায়, সাবেক প্রতিমন্ত্রী, মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২৩০

১৬. ১৯১৮ সনে একবার আমার আব্বার সাথে মাইজভাণ্ডার শরিফ এর ঘটনা মনে পড়ে। হযরত বাবাভাণ্ডারী কেবলার হুজরা শরিফের সামনে আমার আব্বার সাথে দাঁড়িয়ে বাবাজানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর হাতে পানি ঢালা হচ্ছিল। ৬৫ বৎসর পূর্বে দেখা সেই শান্ত, সৌম্য, সুন্দর চেহারা আজও আমার মনে আছে। ১৯৮৪ সনে হজ্জ করতে গিয়ে একদা হেরেম শরিফের কাছাকাছি কোনো কোনো হোটеле অবাস্থিত কাজকর্মের খবর শুনে বিষন্ন ও জিজ্ঞাসামনে শুয়ে পড়ি। স্বপ্নে কে যেন আমাকে বললেন- “কেন মাইজভাণ্ডার শরিফ যাওনা?”। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক নামটিও উচ্চারণ করলেন। তখন আমার স্মৃতিতে আব্বার সাথে বাবাজানকেবলার জেয়ারত, হযরতকেবলার প্রতি [গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী।] আল আজহারের রেস্তোরের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা মনে পড়ল। চাঁটগায়ের বাসিন্দা হয়েও মাইজভাণ্ডার শরিফ যাইনি বলে দুঃখিত হলাম এবং মনে মনে নিয়ত করলাম। ডিসেম্বরে তাঁর [শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী] খোশরোজের দাওয়াত পেয়ে সেমিনারে অংশগ্রহণ করি। সেমিনার শেষে আমাদের বাবাজানের [জিয়া বাবা] খেদমতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, দোয়া করেন, বিদায় দেন। পরবর্তীকালেও দরবার শরিফ গিয়েছি। তাঁকে একনজর দেখাই সৌভাগ্য বলে মনে হত। তিনি ছিলেন সার্বিকভাবে আল্লাহপাকের সাথে একাত্ম। তা না হলে তাঁর যেসব বিশ্বজোড়া ক্রিয়াকর্ম, কেরামত প্রকাশ পেয়েছে, তা কখনে সম্ভব হতোনা - ব্যারিষ্টার বজলুস সাত্তার।^{১৬}

১৬ আলহাজ্ব ব্যারিষ্টার বজলুস সাত্তারের একান্ত স্মৃতিচারণ। শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীঃ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, পৃ. ৪২.

১৭ মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রবর্তক হযরত গাউসুল আযম শাহসুফি সৈয়দ আহমদউল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর আবির্ভাবের পর থেকে বিশ্বঅলি শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) পর্যন্ত মাইজভাণ্ডারী সুফিসাধকগণ জাগতিক জীবনকে সুন্দর ও সত্যে দীক্ষিত করে গেছেন।-বজলুর রহমান ভূইয়া।^{১৭}

১৭ বজলুর রহমান ভূইয়া, সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন নারায়নগঞ্জ। মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২২৫

১৮ প্রজ্ঞার আলোকে তিনি ছিলেন দেদীপ্যমান সূর্যের প্রাণবন্ত অস্তিত্ব। অজেয় জীবন চর্চায় স্রষ্টার সকল সুন্দরতম উপাদানকে শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারী ধর্ম বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানকে তিনি স্বীকৃতি দেন আধ্যাত্মিক ভাববাদিতার সাযুজ্যে। আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের সত্যকে তিনি নিরন্তর দ্বন্দ্ব হতে তুলে নিয়ে আপন শ্রীমন্ত স্বভাবের শৈল্পিক সৌন্দর্যে ও ছন্দের প্রজ্ঞা ও প্রেমের নির্যাসে সখ্যতার অসাধারণত্বে একীভূত করেছিলেন। সুফি সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ বিষয়ে অন্য কাউকে এমন দেখা যায় না।

১৮ শওকত হাফিজ খান রুশ্নি - মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক,

রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বঃ সাব-রেজিষ্টার, চাঁদগাও, চট্টগ্রাম।

১৯ মাইজভাণ্ডারী তরিকার আদর্শ ও দর্শনের অবস্থান শরিয়তি সীমানার বাইরে নয়। সত্যিকার অর্থে এটি মানবতাবাদী দর্শন। সত্যসন্ধানী সকল মানুষ এই দর্শনের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফ বিভিন্ন জাতি ধর্মের মিলনকেন্দ্র হিসেবেও সুপরিচিত। এই সর্বজনীন মিলনকেন্দ্র হওয়ার পেছনেও রয়েছে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সর্বজনীনতা।

প্রতিবছর রবিউল আউয়াল মাসের বিশ তারিখ যে বৃহৎ আকারের মিলাদুন্নবী (দঃ) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, যাতে আমি একজন ওয়ায়েজ হিসেবে উপস্থিত থাকি, সেই উল্লেখযোগ্য মিলাদুন্নবী (দঃ) মাহফিলটা করা হয় হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশে। তিনি ওফাতের পূর্বে তাঁর আওলাদদের তদীয় সমাধিতে সৌধ নির্মাণ এবং ওরশ না করার অঙ্গীকার করে যান। যে কারণে তাঁর মাজার নির্মিত হয়নি এবং বার্ষিক ওরশও পালিত হয় না। তবে ওরশের পরিবর্তে মিলাদ মাহফিলের কথা বলেছিলেন। মিলাদ মাহফিলে দেশের খ্যাতিমান আলেমদের দাওয়াত করা হয়। তদীয়পুত্র শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ছিলেন মজজুবে সালেক। তাঁদেরকে বুঝা ও অধ্যয়ন করা সহজসাধ্য নয়। এক কথায়, গাউসুল আযম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী দর্শন নিয়ে এখনও অধ্যয়ন ও গবেষণার অনেক কিছুই বাকি আছে। -- মাওলানা নুরুল ইসলাম হাশেমী।^{১৯}

১৯ ইমাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। সমকালের চট্টগ্রামে যে কয়জন দ্বীনে আলেম খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন তাঁদের অন্যতম মাওলানা নুরুল ইসলাম হাশেমী।

২০ শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বংশসূত্রে এবং নিজস্ব সাধনা বলে এমন একটা আত্মিক স্তরে উন্নীত হন, যে স্তরে তিনি সবসময় আল্লাহর ফানিয়তের মধ্যে ফানা বা বিলীন হয়ে ডুবন্ত থাকতেন। সে কারণে বাহ্যিক আচার-আচরণ দিয়ে তিনি বিচার্য নহেন। তিনি বুঝবার মানুষ নন, বাজবার মানুষ। তাঁর অন্তরের মধ্যে ঝংকার সৃষ্টি হতো। আমি বয়সে তাঁর বড়, কিন্তু তিনি বুজুর্গ বড়। তিনি খুব বড় বুজুর্গ। আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি, এই সমস্ত অলি আল্লাহদের উসিলায় আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দিন, জান্নাত দিন। -অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী।^{২০}

২০ আক্ষরিক অর্থেই একজন সফল শিক্ষক ও অধ্যক্ষের প্রকৃতি অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাইল করিম চৌধুরী। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্রবহুল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ হিসেবে এক গৌরবময় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সম্মানিত শিক্ষক হওয়ার গৌরবেও গৌরবান্বিত।

২১ শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারীকে অতি নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যতই দেখেছি ততই বিস্মিত হয়েছি, অভিভূত হয়েছি। কখনো যাচাই করার দুর্মতি হয়নি।

বুকভরা ভক্তি নিয়ে মনে মনে নিজেকে নিবেদন করতে চেষ্টা করেছি। আর শেষতক নিরাশ হইনি। আমার আকুতি তাঁর অজানা নয়। অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ।^{২১}

২১ অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, সম্পাদক, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম।

২২ ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব নিয়ে বিদেশী জাহাজে কাজ করতে গিয়ে কতবার ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়েছি। ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের পর বিদেশী সাহায্য সামগ্রী নিয়ে একসাথে আসা বহু জাহাজের জট সরিয়ে বার্থিং দিতে বন্দরে দিনরাত কাজ চালাতে হয়েছে। বিরতি ছাড়া দুই শিফট অর্থাৎ ১৬ ঘন্টার অধিক একটানা কাজ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ মহান কর্মীপুরুষ আমার অফিসার কলোনীর বাসায় ক'বার অবস্থানে দেখেছি- খাওয়া নাই, গোসল নাই, বিশ্রাম নাই, দিন রাত একটানা নিজের কাজ নিয়ে মহাব্যস্ত। এমন নজিরবিহীন অক্লান্ত কাজের লোক জীবনে অন্যটি দেখিনি।^{২২}

২২ ক্যাপ্টেন রমজান আলী, সাবেক ডেপুটি কনজারভেটর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর।

২৩। কয়েকজন মন্ত্রির মাইজভাণ্ডার শরিফ সফরকালীন প্রটোকল এর দায়িত্ব পালন করেছি। তন্মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাবেক শিক্ষা, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সাবেক ধর্ম মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ.কে. আমিনুল ইসলাম, সাবেক যুব উন্নয়ন এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমদ বাবলু প্রমুখ। এসব ডাকসাইটে দেশের সেরা রাজনীতিবিদদেরকে তাঁর সাক্ষাতে ভয়ে কাঁপতেও দেখেছি। দীপ্ত জজ্বাহালে কেইবা তাঁর সম্মুখে স্বাভাবিক কথা বলতে পারে? আবার শান্ত ছলুক অবস্থায় ছোট শিশুর অনাবিল কর্মকাণ্ড, মধুর হাসি ও অপার্থিব আন্তরিক ব্যবহারে নিজের সত্তাকে ক্ষনিকের তরে হলেও ভুলে যায়নি তেমন দর্শনার্থী কেউ ছিলেন বলেও মনে হয় না। দীর্ঘ চাকুরী জীবনে কত শ্রেণী পেশার লোকের সাথে মিশেছি। কিন্তু জীবনে এমন লোকের দেখা আর পাইনি। তাঁর মধ্যে আমি এক নিষ্পাপ শিশুকে দেখেছি।^{২৩}

২৩ তফাজ্জল আহমদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

২৪ মাইজভাণ্ডারের পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ হাহেব, মাওলানা গোলাম রহমান হাহেব, সৈয়দ জিয়াউল হক হাহেব প্রমুখ আল্লাহর পথে চলা এমনভাবে শিখেছিলেন ও রপ্ত করেছিলেন যে, সেই পথে তাঁদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, দেখে দেখে, ধীরে ধীরে চলতে হতোনা, না দেখে দ্রুততার সাথে চলা বা দৌড়ানো তাঁদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সেই পারফরমেন্সের কথা শুনে কেউ কেউ তা' অসম্ভব বলে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ ভাবে কিভাবে তা সম্ভব। অনেকে অবশ্য শরীয়তের নিয়মাবলী পালনে ব্রত। এঁদের মধ্যে সত্যিকারের ঐকান্তিকগণ এগিয়ে যাচ্ছেন, অন্যেরা একইস্থানে মার্কটাইম

করছেন - এম.এ মোবারক^{২৪}

২৪. এম.এ মোবারক, সাবেক জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
বর্তমানে, নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন-ঢাকা।
মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ১৩৪

২৫। একজন আশোক-ভক্ত হিসেবে মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফকে অতি কাছে থেকে দেখবার এবং জীবন দিয়ে উপলব্ধি করার এক দুর্লভ সুযোগ ঘটেছে আমার জীবনে। এক যুগসন্ধিক্ষণে মাইজভাণ্ডারী মহান আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) কদমে নিজেকে নিবেদন করে যে অভয়বাণী ও মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছিলাম এবং পরবর্তীকালে তদীয় সুযোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র, বর্তমান সাজ্জাদানসীন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ) এর মাধ্যমে যে ধারা প্রবহমান তা আমার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের এক পরম ও চরম পাথেয়। যেকোন পর্যায়ের আশেক ভক্তকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক তথা শত বছরের ইতিহাসে যে অনন্যসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় বার্ষিক ওরশ শরিফসমূহে। আক্ষরিক অর্থে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কয়েক লক্ষ লোকের স্বতঃস্ফূর্ত মহাসমাবেশের মাধ্যমে বার্ষিক ওরশসমূহ মাইজভাণ্ডারী তরিকার অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য ঘোষণা করে চলেছে। উপমহাদেশের স্বনামধন্য আধ্যাত্মিক প্লাটফর্ম মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে এবং এর বিকাশমান ধারার সৃজনশীল তাত্ত্বিক গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে ন্যূনতম হলেও আত্মনিয়োগ করতে পেরে সমগ্র সত্তা দিয়ে কায়মনোবাক্যে নিজেকে ধন্য মনে করছি। - সাদেক আহমদ^{২৫}

২৫ সাদেক আহমদ, সভাপতি, মাইজভাণ্ডার গবেষণা পরিষদ-ঢাকা, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ২৩৭

২৬ রুহে ইনসানীকে রুহে রহমানীতে উন্নীত করে, ইনসানকে ইনসানে-কামেলে উন্নীত ও বিকাশের ক্ষেত্রে এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর জন্ম থেকে ঐ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁর ওফাতের (১৯৮৮) মধ্যকার ৬০ বছর সময় কালটি ছিল প্রায় পুরোটাই আধ্যাত্মিকতার মোড়কে আবৃত।

তাঁর কিংবদন্তিতুল্য কেলামত সমূহকে বেষ্টন করে, পতঙ্গতুল্য শত-সহস্র আশেকভক্তকে আকৃষ্ট করে তাদের আল্লাহ ও রাসুলের পথে ধাবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য ভূমিকা আজও মাইজভাণ্ডারী পরিমন্ডলসহ সাধারণের মুখে মুখে উচ্চারিত, পরম শ্রদ্ধা ও সমীহের সাথে স্মরণীয়। - “হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর” তাঁর এ বাণী যেন কুরআন-সুন্নার পথে শাস্বত আহবানের চিরায়ত ধারায় মাইজভাণ্ডারী তরিকার মর্ম বাণীর প্রতিনিধিত্বমূলক চুম্বকসার প্রতিফলন। স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি-তুলনায় প্রাথমিক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের কারণে স্থবির সমাজের অনেকে জ্ঞান, চিন্তা ও মননের সীমাবদ্ধতার কারণে মাইজভাণ্ডারী তরিকার কর্মকাণ্ডকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর চারিত্রিক মাধুর্য,

ব্যাপক জীবন ঘনিষ্ঠ অঙ্গুর্য কেলামত ও অমীয় বাণীসমূহ সমকালীন সমাজ জীবনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে মাইজভাণ্ডারী তরিকাকে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্র ও সমাজের উচ্চপর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন, পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাঁর কিংবদন্তিতুল্য কেলামত ও অমীয় কালাম সমূহ আজও হাজারো আশেক-ভক্তের মুখে মুখে উচ্চারিত। আপাত দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বা সমন্বয়তার অভাব, সে ক্ষেত্রে শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিকভাবে তাঁর অনুপম শৈল্পিক নান্দনিকতায় ব্যঞ্জনাপূর্ণভাবে ধারণ ও প্রজ্ঞামণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করে উভয় ক্ষেত্রে চিরায়ত চিন্তা ও মননের জগতে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন, যা রীতিমতো উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার বিষয়ে পরিগণিত। এতদবিষয়ে ইতোমধ্যে ঢাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক ও গবেষক ড. মঞ্জুরুল মান্নান “পীর ও প্রতীকী” (SEMIOTIC PRESENCE) শিরোনামে গবেষণা শুরু করেছেন, যার কেন্দ্রবিন্দু শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেলামত।

তাঁর এ দৃষ্টি আকর্ষণীয় জীবনঘনিষ্ঠ ধারাকে সুপরিকল্পিতভাবে সাংগঠনিক কাঠামোতে এনে জ্ঞান, মেধা-মনন ও প্রযুক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে তাঁর স্মরণে গঠিত ট্রাস্টের মাধ্যমে তদীয় একমাত্র পুত্র ও স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানসীন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান এর নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তর কর্ম প্রচেষ্টা ও প্রজ্ঞার সু-সমন্বয়ে যে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড, শাহানশাহ বাবাজানকে যুগোপযোগী নতুন অবয়বে উপস্থাপনের ইমানী যোশের যে প্রাণময় গতিময় অভীক্ষা, সতত প্রাণচাঞ্চল্যময় নিত্যনতুন সৃজনশীল কর্ম উদ্যোগ, তা ইতোমধ্যেই মাইজভাণ্ডার পরিমন্ডলের পাশাপাশি বিদ্বৎ সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণেও সমর্থ হয়েছে অবলীলাক্রমে।

আমার একান্ত বিশ্বাস, বাবার যোগ্যতম উত্তরসূরী হিসেবে সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানের অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য, সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা, সর্বক্ষেত্রে অনুকরণীয় পরিমিতিবোধ, সজাগ সচেতনতার মাধ্যমে নির্মোহ ও নৈব্যক্তিক পরিচালনায় “শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট” সমকালের দাবী পূরণ করে আগামীতে দেশে এবং বহিঃবিশ্বে সমগ্র মাইজভাণ্ডারকে বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্যিকার অর্থে একান্ত দায়িত্বশীলতার সাথে প্রতিনিধিত্ব এবং একইসাথে সমীহ জাগানিয়া মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপনের একক সংগঠনে পরিগণিত হবে, যা শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী সহ সমগ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফকে যথাযথভাবে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে এক অভাবনীয় নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করবে; যা হবে শত বছরের সামগ্রিক মাইজভাণ্ডারের ইতিহাসের এক কালোপযোগী অনন্য সৃজনশীল মাইলফলক। - ড. সেলিম জাহাঙ্গীর^{২৬}

২৬ সেলিম জাহাঙ্গীর, মাইজভাণ্ডার বিষয়ে ঢাকা বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো। যার ফসল ১৯৯৯

সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ‘মাইজভাগুর সন্দর্শন’। পরবর্তীকালে মাইজভাগুর ও সুফিতত্ত্ব বিষয়ে ফিনল্যান্ডের ফিনিস একাডেমীর রিসার্চ ফেলো। মহাসচিব, গাউসুল আযম মাইজভাগুরী ওফাত শতবার্ষিকী-জাতীয় কমিটি।

২৭ বংশগত পবিত্রতা ও অসাধারণ ইবাদত রিয়াজত এর মাধ্যমে আমার মামু সাহেব হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী আল্লাহর এমন নৈকট্য লাভ করেছেন, যেখানে আগামী এক হাজার বছরে অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। নিঃসন্দেহে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠালি। --মাওলানা আবদুল কুদ্দুস মাইজভাগুরী^{২৭}

২৭ শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ), পৃ. ৩৩৮।
২৮ কেউ যদি আল্লাহ ও রাসুলের রেজামন্দি হাসিল করতে চায়, দরবারশরিফ হক বাবাজানের নিকট চলে যাক, বেলায়তের বর্তমান সম্রাট তিনি, প্রেসিডেন্ট। সব ক্ষমতার মালিক, যা চান করতে পারেন। - এয়ার মুহাম্মদ ফকির।^{২৮}

২৮ শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ), পৃ. ২৭৫।
২৯। শাহানশাহ হক ভাগুরী এমন এক উচ্চ মর্যাদার অলি আল্লাহ, তাঁর ইচ্ছার উপর যুগের অন্য কামেল অলিদের ভালমন্দ নির্ভরশীল। তাঁর বেলায়তি দণ্ডের এমন ক্ষমতা যে, কোন চোরকেও তিনি মুহূর্তে আবদাল বানাতে পারেন।^{২৯}

২৯ মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ চাটগামী (প্রকাশ: বুড়া মৌলবী), শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) পৃ. ৩৩৮।

৩০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পুনরায় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস চালু হওয়ার পর জনাব সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী সাহেবকে আমাদের সহপাঠী হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাদের সাথে নবম শ্রেণীতে যোগদান করেন। আমরা তাঁকে অত্যন্ত ভদ্, বিনয়ী ও সদালাপী সাথী হিসেবে পেয়েছিলাম। তিনি যে অনেক গুণাগুণের অধিকারী ছিলেন তা তখন থেকে বুঝা যেত। ঐতিহ্যবাহী ওই স্কুলের সকল ছাত্র ও শিক্ষকগণ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও সম্মের দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি তখনকার সময়ের একমাত্র ছাত্র ছিলেন, যিনি স্কুলে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরে আসলে কোন শিক্ষকই কোন প্রকার কটুবাক্য বলতেননা। আমাদের আরবী শিক্ষক তাঁকে ক্লাসে ‘হজুর’ বলে সম্বোধন করতেন ও তাঁর সামনে আমাদেরকে আরবী পড়াতে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর মত একজন আধ্যাত্মিক কামেল ব্যক্তির সাথে একই স্কুলে পড়াশোনা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। রেজাউল করিম^{৩০}। ৩০ মাসিক আলোকধারা ডেস্ক।

৩১ আমার বড় মিঞা আল্লাহর পাগল। সাধনা বলে যেখানে উঠেছেন তার উপরে ইনসানিয়াতের (মানবতার) কোন স্তর নাই। (পৃ. ৮০) যে শক্তি আমি তাঁর উপর ঢেলেছি, মনির পাহাড়ে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) ঢাললে সে পাহাড়ে টলে যেত; সাগরে দিলে সাগর জলশূণ্য মরুভূমি হয়ে যেতো। আমার রক্তের বাণ (উত্তরাধিকারী) বলে এখনো টিকে আছে। (পৃ. ৭১) বড় মিঞার খেদমত, আমারই খেদমত। (পৃ. ৯৫)।

মানবতার সর্বোচ্চ স্তরে আমার বড় মিঞার অবস্থান। তিনি বাবাজান কেবলার মসলকের অলি। বাবাজান কেবলা গাউসুল আযম বিল বেরাসত হযরত মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাগুরী (কঃ) ও মতিউর রহমান শাহ সাহেবের (রঃ) খোশরোজ তো হয়; তাই আমার বড় মিঞার খোশরোজও হতে পারবে। (পৃ. ১০৯) সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী।^{৩১}

৩১ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী, তদীয় পিতা ও মাইজভাগুরী ত্বরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ‘অছিয়ে গাউসুল আযম’ নামে সর্বত্র পরিচিত ও প্রচারিত। শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) পৃ. ৮০, ৭১, ৯৫, ১০৯।

৩২ বড় দাদা হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী। শৈশবকাল হতে বাবা-মা ভাই-বোনদের শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসায় সেবা-যত্ন ও আদর করতেন। সাধনার তুংগ সময়ে অত্যধিক জজব অবস্থায় মারমুখো হলেও যখনি ছলুক বা শান্ত থাকতেন তখনকার অমায়িক ব্যবহার অতুলনীয়। রওজা শরিফ পুকুরের বাগান বাড়ীতে আলাদা করে দেওয়ার পরও বাবাকে দেখতে আসতেন। সেবক-সেবিকা সন্তোও নিজ হাতে সেবা করতে চাইতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রতিবেশী সকলের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করতেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে আত্মীয়দের বাড়ি-বাসায় গিয়ে দেখাশুনা ও খবরাখবর নিতেন। তাঁর মত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আমাদের অন্য ভাইদের কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। - ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভাগুরী।^{৩২}

৩২. ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভাগুরী, তদীয় ভ্রাতা, জিন্দাদার, সদরুল মোনতাজেমীন ও সাজ্জাদানশীন, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিল, ভাগুর শরিফ, চট্টগ্রাম।

৩৩ “হকুল একীন অর্থাৎ উচ্চতর বিশ্বাসের অধিকারী যাদের আর্জি ফরিয়াদ তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, তাঁরাই ‘শাহ’। বাবাজানের [শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ)] উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আশেক ভক্ত রয়েছে যাদের আর্জি ফরিয়াদ তৎক্ষণাৎ কবুল হয়। তাঁদের মধ্যে বাংলা, ইংরেজী, আরবী পড়া আলেম, কিছু নিরক্ষর লোকও রয়েছে। বিশ্বসমাজে বিপুলসংখ্যক লেবাসী নামধারী ‘শাহ’ও থাকেন যাদের তুলনা সজীবতা ও গন্ধহীন প্লাস্টিক এবং কাগজে ফুল। বিপুল মুরিদের সংখ্যা, বড় মজলিস মাহফিল কিংবা বিশাল জানাজা কামেল হওয়ার দলিল নয়, খোদার নূরী সংযোগই একমাত্র দলিল। “খোদা-রাসুলের নূরী প্রতিনিধিত্ব মূলে বাবাজান হক ভাগুরী সর্বজয়ী শাহানশাহ”। - সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান^{৩৩}

৩৩. সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান, তদীয় একমাত্র পুত্র ও মনোনীত খলিফা। সাজ্জাদানশীন গাউসিয়া হক মন্জিল এবং ম্যানেজিং ট্রাস্টি, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) ট্রাস্ট, মাইজভাগুর দরবার শরিফ-চট্টগ্রাম। সূত্র: শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) পৃ. ৩১১

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধান

• জাবেদ বিন আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আশারা মোবাশ্শারা :

মহানবী (দঃ) পৃথিবীতে অবস্থানকালে দশজন সাহাবাকে (রাঃ) বেহেশ্তবাসী ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান যুন্নুরাইন (রাঃ), হযরত মওলা আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রাঃ) এবং হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)। দশম হিজরী সনে মদীনায় দুর্ভিক্ষ বিরাজ করায় মানুষ খাদ্যাভাবে অনাহার অর্ধাহারে কালতিপাত করতে থাকে। কোথাও থেকে কোন প্রকার খাদ্য আসার কোন সম্ভাবনা না দেখে সকলের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছিল। এ ধরনের দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে একদিন মহানবী (দঃ) মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবীদের সম্মুখে খুতবা প্রদান করছিলেন। উপস্থিত সকলে একাত্ম অবস্থায় মহানবীর (দঃ) খুতবা (ভাষণ) শুনছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে খবর দেন যে, “সিরিয়া থেকে একদল বণিক প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্য নিয়ে এসেছেন। তারা এ খাদ্য শস্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক।” সংবাদ শুনে খুতবা শ্রবণরতদের প্রায় সকলেই বণিক দলের দিকে ধাবিত হয়ে পণ্যের দাম দস্তুর শুরু করেন। তখনও মহানবী (দঃ) তাঁর খুতবা অব্যাহত রাখেন। প্রায় সকলে মসজিদে নববী থেকে বাইরে এসে বণিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হলেও দশজন সাহাবা তখনো একাত্মচিত্তে গভীর তন্ময় অবস্থায় মহানবীর (দঃ) খুতবা শুনছিলেন। মহানবী (দঃ) খুতবা প্রদানকালে উপর্যুক্ত দশজন সাহাবাকে (রাঃ) দুনিয়াতে অবস্থানরত অবস্থায় বেহেশ্তবাসী ঘোষণা দেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা “আশারা মোবাশ্শারা” নামে সুপরিচিত। আশারা মোবাশ্শারার বাংলা অর্থ হচ্ছে “দশজন সু-সংবাদপ্রাপ্ত”। এ দশজনের মধ্যে চারজন খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকায় বিশ্ববাসী তাঁদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। অন্য ছয়জন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে ইসলামের ইতিহাসে তাঁদের নাম বার বার আলোচনায় এসেছে। এ ছয়জনকে বলা হয় “সিতাতুল বাকিয়াহ”—অর্থাৎ বাকী ছয়জন। মসজিদে নববীতে এই খুতবা চলাকালে নাজিল হয় সূরা জুমআ এর শেষ আয়াত, “আর যখন তারা কোথাও ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা কোন তামাশা দেখে, তখন তারা আপনাকে (খোতবায়) দণ্ডায়মান

অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে চলে যায়। আপনি বলে দিন যে, (তোমাদের জন্য) আল্লাহর নিকট যা কিছু রয়েছে, উহা বাণিজ্য এবং তামাশার চাইতে বহুগুণে উত্তম। আর আল্লাহ সব চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা।”

আসহাবে সুফ্ফা :

মারিফাত জগতের অনন্য জ্যোতিষ্ক হযরত আলী হাজবিরী দাতাগঞ্জে বখশ লাহোরীর (রহঃ) মতে “খোলাফায়ে রাশেদীন ও আহলে বাইতের পর আসহাবে সুফ্ফা হলেন তরীকতপন্থীদের ইমাম।” পবিত্র কুরআনে আসহাবে সুফ্ফা সম্পর্কে মহানবীর (দঃ) প্রতি সূরা আন আমের ৫২নং আয়াতে কঠিন নির্দেশনামূলক আয়াত লক্ষ্য করা যায়। এই আয়াত হচ্ছে, “আর তাঁদেরকে বিতাড়িত (বিমুখ) করবেন না, যাঁরা সকাল বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে আর তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাঁদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্র তাঁদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।” হযরত দাতাগঞ্জে বখশ (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে, “যাঁরা দিবারাত্র আল্লাহকে ডাকেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন, তাঁদেরকে স্বীয় সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না।” উপরোক্ত আয়াতের অনুবাদের মর্মার্থ একই রকম হলেও ভাষা ও শব্দ প্রয়োগে মহানবীর (দঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে তারতম্য আছে। এই তারতম্যের মধ্যে ইলমে তরীকতের শাদ্বিক প্রশিক্ষণ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। আসহাবে সুফ্ফা সম্পর্কে নাজিল হওয়া এই আয়াতে আল্লাহ্পাক মহানবীকে (দঃ) লক্ষ্য করে অত্যন্ত কঠিন শব্দ ব্যবহার করে সতর্কতার নির্দেশনা দিয়েছেন। এই আয়াত থেকে কুরআনিক ভাষায় আসহাবে সুফ্ফার মর্যাদা এবং আল্লাহর দরবারে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আহলে সুফ্ফা সম্পর্কিত আরেকটি আয়াত সূরা মুজাম্মিলে (২০নং আয়াত প্রথমংশ) লক্ষ্য করা যায়। মহানবীকে (দঃ) উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্পাক বলেন, “হে নবী! আপনার প্রতিপালক জানেন, আপনি কখনো রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক, কখনো এক তৃতীয়াংশ জেগে থাকেন। আর আপনার সাথীদের একটি দলও জেগে থাকেন আপনার সাথে---।”

মহানবী (দঃ) মদীনায় মসজিদে নববীর একটি নির্দিষ্ট জায়গা বেদীর মতো উঁচু করে আল্লাহ প্রেমিক, গৃহহীন, সংসারের বন্ধনহীন দূর্গত অসহায়ের মতো জীবন ধারণ করতেন, যাঁরা

জীবন ধারণের কোন উপায় অবলম্বন নিতেন না তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। উঁচু জায়গাকে চাতাল বা চবুতরা বলা হয়ে থাকে, আরবী ভাষায় বলা হয় সুফফা। সুফফায় অবস্থানরতদেরকে বলা হয় আসহাবে সুফফা। বিভিন্ন বর্ণনা মতে আসহাবে সুফফার সংখ্যা সর্বোচ্চ চারশতে উপনীত হয়েছিল। আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ) আসহাবে সুফফা শিরোনামে লিখিত পুস্তিকায় তিনশত জনের নাম পরিচয় উল্লেখ করেছেন। হযরত দাতাগঞ্জ বখশ (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত “কাশফুল মাহজুব” পুস্তকে তেত্রিশজন সুফফার নাম উল্লেখ করেছেন। আসহাবে সুফফাগণ ছিলেন সংসার বিরাগী। তাঁদের কোন পরিবার পরিজন ছিল না। তাঁদের মধ্যে যারা পরবর্তী সময়ে বিয়ে শাদী করতেন তাঁরা গৃহী হতেন এবং দ্বীন প্রচারে সময় ব্যয় করতেন। আসহাবে সুফফার সর্বত্যাগী দলটি সর্বাবস্থায় মহানবীর (দঃ) সান্নিধ্যে অবস্থান করতেন। তাঁরা হুজরা শরিফের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর জিকির এবং ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁদের কেউ কেউ দিবাভাগে কখনো কখনো জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রয়ের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করে সকলে মিলে খেতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহানবীর (দঃ) গৃহ থেকে তাঁদের জন্য খাবার প্রেরণ করা হত। হযরত ফাতিমা যাহুরা (রাঃ) আসহাবে সুফফার প্রতি সর্বক্ষণ যত্ন নিতেন। তাঁর বিবাহের পর তিনি পূর্ববৎ সময় দিতে পারতেন না। ফলে মহানবী (দঃ) স্বয়ং তাঁদের প্রতি যত্ন নিতেন। অনেক সময় তাঁদের খাবারের বিষয়ে সাহাবাদেরকে নির্দেশনা দিতেন। অবস্থা সম্পন্ন সাহাবাদেরকে সুফফাদের জন্য খাবার প্রেরণের নির্দেশ দিতেন। এ কারণে কোন কোন সাহাবা স্থায়ী গৃহে প্রতিদিন অতিরিক্ত খাবার প্রস্তুত করতেন। রাত্রে তাঁরা নিজেদের অবস্থানস্থলে বসে ইবাদত বন্দেগী এবং ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। দিনের বেলায় তাঁরা মহানবীকে (দঃ) ঘিরে বসতেন এবং আধ্যাত্মিক তালিম নিতেন। তিনি তাঁদের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। তাঁদের কারো নিকট দুটি বস্ত্র ছিল না। অনেকে কাঁধের উপর একটি চাদর ঝুলিয়ে কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করতেন। বস্ত্রের অভাবে কেউ কেউ কোন রকমে চতর ঢাকার কাপড় পরিধান করতেন। কাপড়ের স্বল্পতার কারণে কারো কারো পৃষ্ঠদেশ আবৃত হতো না। মহানবী (দঃ) প্রায়শ তাঁদেরকে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘিরে বসতেন। অনেক সময় তাঁরা দুই তিনদিন পর্যন্ত উপবাসে কাটাতেন। ধর্মভীরু কঠোর তপস্যারত আসহাবে সুফফারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁরা কখনো কারো নিকট থেকে খাবার বা অন্য কিছুর জন্য হাত বাড়াতেন না। কোন না কোন উপায়ে তাঁদের নিকট খাবার না আসা পর্যন্ত তাঁরা পরম ধৈর্য ধারণ করে শুধু ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। খাবার বা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি তাঁরা আগ্রহ দেখাতেন না। পেলে খেতেন এবং আল্লাহর শোকর গুজার করতেন। না খেলেও হাসি মুখে সন্তুষ্টচিত্তে

সবরে থাকতেন। অনাহার জনিত দুর্বলতার কারণে তাঁরা অনেক সময় নামাযের কাতারে দাঁড়াতে গেলে পড়ে যেতেন। তিরমিজি শরিফে তাঁদের বাহ্যিক চলাফেরাকে ‘উন্মত্ত, উন্মাদ উদ্ভ্রান্ত মনে হত’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাদকার খাবার মহানবী (দঃ) সমীপে প্রেরিত হলে তার সম্পূর্ণ আসহাবে সুফফার জন্য প্রেরিত হত। দাওয়াত অথবা ওয়ালিমার খাবার আসলে মহানবী (দঃ) আসহাবে সুফফাদের সাথে নিয়ে খেতেন।

হযরত ফাতিমা যাহুরা (রাঃ) যখন হযরত আলীর (রাঃ) সংসার নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন তাঁকে সাহায্য করার মতো কোন দাস দাসী ছিল না। হযরত মওলা আলীর (রাঃ) কোন বিষয় সম্পত্তি ছিল না। তিনি জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করতেন। স্বল্প অর্থ দিয়ে আহলে বাইতের চারজনকে নিয়ে খুবই কষ্টের মাধ্যমে সংসার চালাতেন। হযরত আলী (রাঃ) মশকে পানি ভর্তি করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতেন এবং যা সামান্য উপার্জন করতেন তা দিয়ে খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করতেন। কখনো উপাদেয় খাবার জুটত না। রাসূল (দঃ) এর দুলালী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহুরা (রাঃ) গম পেশার কাজ করে কিছু উপার্জন করতেন। গম পিষতে পিষতে তাঁর হাত ফেটে যেত। একই সঙ্গে পানি ভর্তি মশক বহন করতে করতে হযরত আলী (রাঃ) বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতেন। মহানবীকে (দঃ) এ বিষয়টি হযরত ফাতিমা (রাঃ) অবহিত করলে, মহানবী (দঃ) তাঁর অতুলনীয় স্নেহের কন্যাকে বলেন, “পাথরের বেদীর কাছে যারা কোন প্রত্যাশার হাত না বাড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে যাচ্ছেন তাঁদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তাঁদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে আমি আমার পরিজনের কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাব না।” উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে মহানবীর (দঃ) নিকট আসহাবে সুফফার মর্যাদা অনুধাবন করা যায়।

অনাহারে অর্ধাহারে থাকা সত্ত্বেও আসহাবে সুফফারা অত্যন্ত উৎফুল্ল থাকতেন। তাঁরা মহানবীর সম্মুখে সর্বাবস্থায় অবস্থান করার মূল কারণ হলো, মহানবীর (দঃ) অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁদেরকে যখন যে কাজে প্রেরণ করা হতো, তাঁরা জীবন উৎসর্গের নিয়তে সেখানে যেতেন। বিপদ সংকুল স্থানসমূহে তারা ইসলাম প্রচারের জন্য সাগ্রহে যেতেন। পার্শ্ববর্তী বিমুখ এ সকল সাহাবা কেলাম মহান আল্লাহর জিকির এবং মহানবীর (দঃ) প্রেমে বিভোর-নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মানবসেবা, জিহাদ, রাষ্ট্র পরিচালনায় মতামত প্রদান এবং অন্যান্য কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতেন। আসহাবে সুফফার নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা সাহাবা কিরামের মধ্যে সর্বোচ্চ মানে উন্নীত ছিল। মহানবী (দঃ) বীরে মাউনার দলপতি আমের ইবনে তোফায়েলের আশ্বাসের উপর আস্থা রেখে সত্তর জন আসহাবে সুফফাকে বীরে মউনা অভিযানে প্রেরণ করেন। তাওহীদের বার্তা বহনকারী এ সকল আসহাবে সুফফা বীরে মউনায় পৌঁছলে প্রতারণার শিকার হন। আমন্ত্রণকারীর

বিশ্বাস ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কাফেরদের বর্বরোচিত আক্রমণের মুখে ৬৯জন আসহাবে সুফ্ফা বীরে মউনায় শহীদ হন। একমাত্র হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) মুক্তি পেয়ে হুজুর (দঃ) সমীপে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে মহানবী (দঃ) খুবই ব্যথিত হন। মহানবী (দঃ) সর্বদাই বীরে মউনার শহীদদের জন্য দোয়া করতেন। সংসার বিমুখ অথচ অত্যন্ত প্রত্যয়দীপ্ত আসহাবে সুফ্ফারা জিহাদের ময়দানে প্রচণ্ড সাহস নিয়ে শরিক হয়ে প্রমাণ করেছেন তাঁরা নিস্তেজ, নিষ্কর্মা এবং সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নন, বরং তাওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলন রাখতে সদা প্রস্তুত মুজাহিদও বটে।

উল্লেখ্য যে, আসহাবে সুফ্ফার শিরোমনি হযরত বেলাল (রাঃ) শুধু আল্লাহর প্রিয় এবং অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মোয়াজ্জিন ছিলেন না, বরং প্রতিটি জিহাদে তিনি সম্মুখ সারিতে ছিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (দঃ) অবস্থা সমূহের (হাল) রহস্য ভাণ্ডার এবং আহলে বাইতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি খন্দকের যুদ্ধ সম্পর্কিত রণনীতির প্রধান কুশীলব ছিলেন। হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাররাহ আসহাবে সুফ্ফা এবং আশারা মোবাস্শারা পদবীতে ভূষিত হয়ে আনসার-মুহাজিরদের নেতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি অনেক জিহাদে সেনাপতিত্বও করেন। সিরিয়ার রণক্ষেত্রে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এ সময় আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁকে মৃত্যুর ঝুঁকি না নিয়ে মদীনায় ফিরে এসে চিকিৎসা নেয়ার আহ্বান জানালে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, “যেখানে সাধারণ সৈনিকরা শাহাদত বরণ করেছেন এবং প্লেগে আক্রান্ত হচ্ছেন, সেখানে সেনাপতি হয়ে আমি জীবন রক্ষার জন্য ফিরে যাওয়াকে ঈমানী দায়িত্ব মনে করি না।” মজলুম সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে এয়াসির (রাঃ) প্রতিটি সময় জীবন ঝুঁকি নিয়ে তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারে অগ্রগামী থেকেছেন এবং সফফিনের যুদ্ধে সত্যের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখার লক্ষ্যে মওলা আলীর (রাঃ) পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সত্য প্রকাশে এবং সত্যের স্বপক্ষে দৃঢ় থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্যাতন নিপীড়ন বরণ করেছেন। প্রখ্যাত সাহাবী এবং আসহাবে সুফ্ফা হযরত আবুজর গিফারী সত্য, ন্যায় ও মানবসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম, সাধনা এবং সুউচ্চ প্রতিবাদী কণ্ঠের জন্য অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে “সত্যের সৈনিক আবুজর” অভিধা অর্জন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত যায়দ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) প্রমুখ আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন পুণ্যের মনিমুক্তা। আসহাবে সুফ্ফারা হলেন প্রকৃত অর্থে সুফি জীবনবাদের পথিকৃত। পরবর্তী সময়ে তাঁদের জীবনাচারের ভিত্তিতে সুফিবাদের মৌলিক ভিত্তি গড়ে উঠে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ আল্লাহর দুনিয়ায় মস্ত, মজযুব, আল্লাহ পাগল উন্মত্ত উদভ্রান্ত সাধকদের অনন্য প্রাণকেন্দ্র। এ সকল মজযুব,

মস্তুরা আসহাবে সুফ্ফার (রাঃ) মতো সংসার বিরাগী এবং প্রিয়জন বিচ্ছিন্ন বিভোর চিন্তায় ইবাদতকারী। এঁরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগকারী, জীর্ণ শীর্ণ বসনধারী, কখনো কখনো বিবস্ত্র অবস্থায় নিশি রাতে ঘুরাফিরাকারী। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের প্রতিটি রওজার ধারে পাশে গভীর রাতে এদের যখন দেখা যায়, তখন আসহাবে সুফ্ফার চিত্র যে কোন চিন্তাশীলের মানসপটে ভেসে ওঠে।

মহানবী (দঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী চার খলিফা:

আহলে বাইত জিল্লিল নবুয়ত তাজেদারে বেলায়ত, হযরত মওলা আলী মুশকিল কোশা (রাঃ) রেওয়ায়ত করেছেন, “রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, আবু বকরের উপর আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হোক, তিনি নিজের কন্যাকে আমার হাতে সমর্পন করেছেন। মদীনার দিকে হিজরত করে আমার জন্য তিনি যান-বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ‘সূর’ গুহার নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন। বিলালকে তিনি নিজ অর্থে খরিদ করে দিয়েছেন।

উমরের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হোক। কারো নিকট অপছন্দনীয় এবং কটু মনে হলেও উমর সর্বদা হক কথা বলে থাকে। কারো তিরস্কারের পরোয়া করে না। এ হক কথা বলার দরুন তার কোন পার্থিব বন্ধু নেই।”

“আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হোক ওসমানের প্রতি, তার লজ্জাশীলতার দরুন আসমানের ফেরেশতাগণও তাকে লজ্জা করে।”

“আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হোক আলীর প্রতি, ইয়া আল্লাহ! আলী যদিও যাক না কেন, আপনি সত্যকে তার সঙ্গী করে রাখুন।” —(তিরমিযী শরিফ)।

আবু দাউদ থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, তোমরা যদি আবু বকরকে আমীর নির্বাচিত কর, তবে তাঁকে আমানতদার, দুনিয়াকে তুচ্ছ অবজ্ঞাকারী ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহান্বিত পাবে। আর যদি উমরকে আমীর নিযুক্ত কর তবে তাকে দৃঢ়চেতা আমানতদার দেখতে পাবে। অর্থাৎ আল্লাহতা'লার কাজে কারো তিরস্কারের ভয় করবে না। আর যদি আলীকে আমীর কর, আমার ধারণা, তোমরা এরূপ করবে না, তবে তাকে হেদায়েতকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত দেখতে পাবে।”

মহানবী (দঃ) এর সঙ্গে মদীনার রওজায়ে আকদাসে পবিত্রতম মৃত্তিকার আলিঙ্গনে চিরবাসী হয়ে অনন্তকালের জন্য গুয়ে আছেন সিদ্দিকে আকবর, রফিকুল মোস্তফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং ফারুক আযম হযরত উমর ফারুক (রাঃ)। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে তাঁরা দুজন হলেন পরম সৌভাগ্যবান। হুজুর (দঃ) এর খেদমতে জিয়ারত পেশ করতে যাঁরাই রওজা আকদাসে উপস্থিত হন তাঁরা সকলে মহানবী (দঃ) এর প্রতি সালাম পেশ করার পর এ দুজন মহান সাহাবার প্রতিও সালাম পেশ করে থাকেন। এ দুই মহান সাহাবার প্রতি হুজুর (দঃ) এর আস্থা এতোই প্রগাঢ়

ছিল যে, মহানবী (দঃ) যে কোন জরুরী এবং গোপনীয় পরামর্শ একান্তে শুধু তাঁদের দুজনের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। মক্কা বিজয়ের বিষয়ে খুবই গোপনীয় সিদ্ধান্ত মহানবী (দঃ) শুধু এ দুজনকে একান্তে অবহিত করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ গোপন রাখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রসঙ্গ:

১. হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে মহানবী (দঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, শবে মেরাজে আমি যেই আসমানেই পৌঁছেছি, সেখানেই আমার নাম ‘মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর’ এর পরে আবু বকর সিদ্দিকের নামটি লিখিত দেখেছি।” হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, “মহানবী (দঃ) উল্লেখ করেছেন, আমি যদি আল্লাহ্ তা’লা ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু করতাম, তবে আবু বকর কে করতাম। ইসলামের প্রতি আবু বকরের ভ্রাতৃত্ব ও মহবত সর্বাপেক্ষা অধিক সুতরাং মসজিদের দিকে (মসজিদে নববী) আবু বকর ব্যতীত আর কারো গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকবে না।” মহানবী (দঃ) এর বেচালের কিছুদিন পূর্বে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় মহানবী (দঃ) উপরোক্ত ঘোষণা দেন। উক্ত খুতবায় মহানবী (দঃ) উল্লেখ করেন, “আমার প্রতি যতো লোকের এহসান ছিল, সমস্ত এহসানের প্রতিদান আমি দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আবু বকরের এহসানের প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। তাঁর বদলা প্রদান করবেন স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা।” হুজুর (দঃ) এর অন্তিম পীড়ার সময় হযরত বেলাল (রাঃ) এসে মহানবীকে (দঃ) নামাজের সংবাদ জানালে হুজুর (দঃ) হযরত বেলালকে (রাঃ) নির্দেশ দেন, “আবু বকরকে (রাঃ) নামায পড়িয়ে দিতে বলো।” উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা উল্লেখ করেন, “মহানবী (দঃ) বলেছেন, যে দলের মধ্যে আবু বকর উপস্থিত থাকে, তাদের জন্য কখনো সঙ্গত নয় যে, আবু বকর ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করে।” মওলা আলী (রাঃ) উল্লেখ করেন, “মহানবী বলেছেন হযরত আবু বকর এবং উমর বেহেশতের মধ্যে নবী রাসূলগণ ব্যতীত বয়োবৃদ্ধদের সর্দার হবেন।” এ হাদীসটি আহলে বাইত হযরত ইমাম হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এক ব্যক্তিকে হযরত আবু বকরের (রাঃ) অগ্রে চলতে দেখে বলেছেন, “তুমি এমন ব্যক্তির অগ্রে চলছ, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।” তিরমিজি এবং হাকেম বর্ণিত আছে, “হুজুর (দঃ) আবু বকর (রাঃ) ও উমরকে দেখে বলেছিলেন, “এ দুটি দেহ ধর্মের কর্ণ ও চক্ষু।” রাবী-আ-ইবনে আবদুর রহমানের বর্ণনানুসারে হাকেম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব উল্লেখ করেছেন, আবু বকর সিদ্দিক রাসূলুল্লাহর (দঃ) দরবারে উযীরের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি (হুজুর (দঃ)) নিজের সমস্ত কাজে আবু বকরের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ইসলামে তিনি তাঁর (হুজুর (দঃ)) দ্বিতীয় ছিলেন। সূর গুহায়

দ্বিতীয় ছিলেন, বদরের যুদ্ধে হুজুর (দঃ) এর আরীশ নামক শিবিরেরও দ্বিতীয় ছিলেন, হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজুরাস্থিত কবরেও তিনি রাসূলুল্লাহর (দঃ) দ্বিতীয় ছিলেন। হুজুর (দঃ) তাঁর উপর কাকেও অগ্রাধিকার দিতেন না।” হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বিশ্ববিখ্যাত সফল রাষ্ট্রনায়ক হবার গুণাবলী হযরত আবু বকর (রাঃ) এর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, অকৃত্রিমতা, সাহসিকতা এবং দূরদর্শীতা দেখে অর্জন করেছিলেন।

২. হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) ঈমান সরলতা, সততা, দানশীলতা, ন্যায় পরায়ণতা, কর্তব্যবোধ, আত্ম প্রচার বিমুখতা, লোভ লালসা এবং সংসার বিরাগী বৈশিষ্ট্য এতো দৃঢ় ছিল যে প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন “খলিফাতুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)। সূর গুহায় জীবন বাজি রেখে যেমন মহানবী (দঃ) এর পাশে ছিলেন, তেমনি ওহদ পাহাড়ে মহানবীর (দঃ) জীবন রক্ষার লক্ষ্যে নিজেকে কোরবানী দিতে প্রস্তুত ছিলেন। অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও কোমল মনের অধিকারী-এ মহামানব মহানবীর (দঃ) পর ভণ্ড নবী এবং এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করে ইসলামের পয়গাম সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে অকল্পনীয় সাহসিকতার পরিচয় দেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন মহানবীর (দঃ) অত্যন্ত সফল উত্তরাধিকারী।

হযরত উমর (রাঃ) প্রসঙ্গ:

১. হযরত উমর ফারুকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা মহানবী (দঃ) এর বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা “উমর ফারুক”। হযরত উমর ফারুকের ইসলাম ধর্মগ্রহণ বস্তুত পক্ষে মহান আল্লাহর দরবারে রাসূল (দঃ) এর মকবুল মুনাজাতের ফসল। দারে-আকরামে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের লক্ষ্যে উপস্থিত হলে মহানবী (দঃ) স্বয়ং এতো আনন্দিত এবং উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে, বাইয়াত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (দঃ) তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন এবং উপস্থিত সকল সাহাবী “নারায়ে তকবীর” শ্লোগান তুলেন। ফেরেশতা গণের পক্ষ থেকে হযরত জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহকে (দঃ) মোবারকবাদ জ্ঞাপন করে হযরত উমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে উর্ধ্বাকাশের বাসিন্দাদের পরম সন্তুষ্টি এবং আনন্দ উল্লাসের খবরটি জ্ঞাত করেন। স্বীয় গোত্র বনু আদীতে হযরত উমরের (রাঃ) ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় মনোভাব, কঠোরতা এবং অটল অবিচলতা সম্পর্কে এতোই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বনু আদী থেকে একজন ব্যক্তিও বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে কুরাইশদের পক্ষে আসেনি। বদরের যুদ্ধে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) গোলাম মাহ্জা। একবার হযরত উমর ফারুককে (রাঃ) দেখে মহানবী (দঃ) ফরমান, “হে খাতাবের ছেলে! সেই পাক জাতের কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাকে আসতে দেখলে শয়তানও তার গতি পরিবর্তন করে নেয়।” আরেকবার হুজুর (দঃ) উল্লেখ করেন, হে উমর! শয়তানও

তোমাকে ভয় করে (মুসলিম, বোখারী ও তিরমিযী শরিফ)। হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল, আল্লাহ পাক যাদের সঙ্গে কথা বলতেন। আমার উম্মতে সেইরূপ যদি কেউ থাকে, তাহলে তিনি হলেন হযরত উমর (মুসলিম, বোখারী শরিফ)। আবু দাউদ এবং তিরমিযী শরিফে উল্লেখ আছে, “রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত উমর (রাঃ) এর মুখে এবং অন্তরে হুকুম কয়েম করেছেন।” একই বর্ণনায় আছে, “আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তাহলে উমরই হতো। কিন্তু আমার পরে আর কেউ -নবী হবেন না।” (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

২. একদা হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) উমরের (রাঃ) প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, “হে উমর! তুমি আমার প্রশংসা করছ? অথচ আমি রাসূলুল্লাহর (দঃ) মুখে একথা শ্রবণ করেছি যে, সূর্য পর্যন্ত উমরের ন্যায় উত্তম মানুষ দেখে নাই” (তিরমিযী শরিফ)। মওলা আলী মুশকিল খোশা (রাঃ) হযরত সিদ্দিকে আকবর এবং ফারুককে আযম সম্পর্কে মিশর এবং অন্য কয়েক স্থানে সাধারণ্যে উল্লেখ করেছেন, “রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর পর সর্বাধিক মর্যাদাশালী হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং তাঁর পর হযরত উমর (রাঃ)।” একই ধরনের বাক্য হযরত ওসমান গণির (রাঃ) মুখেও বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। এযালাতুল খেফা গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের (রাঃ) বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে, “হযরত উমরের (রাঃ) খেদমতে আমার একঘণ্টা থাকা এক বৎসরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম।” এভাবে সাহাবা কেরামগণ, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণ, আল্লাহর পরম বন্ধু অলি-আল্লাহগণ, এমনকি পৃথিবীর অন্য ধর্মাবলম্বী ঐতিহাসিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদরাও হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমরের (রাঃ) অশেষ প্রশংসা করে অসংখ্য গ্রন্থ লিখেছেন। মহানবী (দঃ) প্রথম দুখলিফার অবস্থান নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন, “আসমান ও জমিনে আমার দু'জন করে উজীর আছেন। আসমানে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এবং হযরত মিকাইল (আঃ), আর জমিনে আবু বকর এবং উমর”। এ হাদীসটি হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক সমর্থিত। হযরত আব্বাস (রাঃ) একই মত পোষণ করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ ইবনে শিরিন (রাঃ) বলেন, “আমি সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে এটি কল্পনাও করতে পারিনা, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমরকে (রাঃ) মন্দ বলে, কি করে সে রাসূলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে মুহব্বত রাখতে পারে (তিরমিযী শরিফ)। উল্লেখ্য যে, হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এবং হযরত উমরের (রাঃ) কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ) মহানবী (দঃ) এর পুণ্যবান

বিবি হওয়ায় উম্মাহাতুল মুমিনীন হিসেবে চির সম্মানিত হয়ে আছেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) প্রসঙ্গ:

১. পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকে হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন মহানবী (দঃ) এর দু'কন্যা হযরত রোকাইয়া (রাঃ) এবং হযরত কুলসুম (রাঃ) এর জামাতা। এ জন্যে তাঁকে যুন্নুরাইন বা দুজ্যোতির অধিকারী-হিসেবে বিভূষিত করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সরল, লাজুক, দানশীল, মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং রাসূলুল্লাহর (দঃ) প্রতি পরম অনুগত ব্যক্তিত্ব। হযরত ওসমান (রাঃ) এতোই সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, মহানবী (দঃ) বলেছেন, “যদি আমার আরো কন্যা থাকত, তবে আমি তার বিবাহও ওসমানের সঙ্গে দিতাম।” উক্ত হাদীসের মর্ম ব্যাখ্যা করে মশহুর আউলিয়া এবং ফানাফির রাসূল (দঃ) হযরত আবদুর রহমান জামী (রহঃ) উল্লেখ করেন, “মানব কূলের মধ্যে কারো এ সৌভাগ্য অর্জিত হয়নি যে, সে আল্লাহর কোন পয়গম্বরের দুকন্যাকে বিবাহ করেছে।” মক্কা হতে হাবশায় হযরত করার সময় রাসূলুল্লাহ (দঃ) উল্লেখ করেন, “হযরত লুত (আঃ) এর পর ওসমানই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি স্বপরিবারে হিজরত করেন।” হযরত মুহাম্মদ (দঃ) “যাতুর রোকা” যুদ্ধে গমন করার সময় মদীনায় হযরত ওসমানকে (রাঃ) নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। হুদাই-বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মহানবী (দঃ) প্রতিনিধি হিসেবে হযরত ওসমানকে (রাঃ) কোরাইশদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। মক্কা হতে হযরত ওসমানের (রাঃ) প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটলে রাসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাদের নিকট থেকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এই বাইয়াত “বাইয়াতে বিদওয়ান” নামে পরিচিত। এ সময় হযরত ওসমানের (রাঃ) অনুপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহর (দঃ) স্বীয় এক হাতকে হযরত ওসমানের হাত বলে প্রকাশ করেন এবং হযরত ওসমানের (রাঃ) পক্ষ হতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, “হুজুর (দঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, “আমি কেন তার কাছে লজ্জা করব না, যেহেতু ফেরেশতারাও তার কাছে লজ্জা করেন।” এযালাতুল খেফা গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) এর উদ্ভূতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, “মহানবী (দঃ) বলেছেন, যতদিন ওসমান জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকবে। ওসমানকে শহীদ করে দেয়া হলে আল্লাহর তলোয়ার কোষমুক্ত হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত আর কোষবদ্ধ হবে না।” বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে অন্তকলহ, যুদ্ধ এবং পারস্পরিক হত্যা যজ্ঞের কারণ অনুসন্ধানের জন্যে মহানবীর (দঃ) উপর্যুক্ত হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবন করা যথেষ্ট। (চলবে)

‘তাক্ফিরী গোষ্ঠীর প্রতিভু’, ‘মুনকেরে আকীদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত’, ‘গোস্তাখে গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী’, আল-মাইজভাণ্ডারী ম্যাগাজিন ডেস্ক’র স্বরূপ উন্মোচন, তাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চলমান পর্ব ২

• আলোকধারা ডেস্ক •

সম্মানিত পাঠক,

‘গাউসুল আযম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদ’ কর্তৃক প্রকাশিত আল-মাইজভাণ্ডারী ম্যাগাজিনের ‘আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক’ তাদের স্বভাবসুলভ আত্মবিনাশী অপরিণামদর্শিতার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার প্রবর্তক, পূর্ণতাদানকারী, খাতেমুল ওলী, গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)’র মর্যাদার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রতি বিদ্রোহ প্ররায়ন মনোভাবের প্রকাশ তাদের ম্যাগাজিনের পরতে পরতে লিপিবদ্ধ করে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর নবাব, সুলতান, অছি, গদির উত্তরাধিকার, খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীগণের ‘সানী গউসে ধন’ ‘সানী ইমাম হোসাইন’কে কুফুরী আকীদার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর আকীদাকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করে ২২ চৈত্র ৪ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক’এ যে অসত্য আরোপ, ধর্মহীনতার অভিযোগ, অপমানজনক বক্তব্য, বিকৃত বিশ্লেষণ, বিপুল স্ববিরোধী বক্তব্য সম্বলিত রচনা প্রকাশ করেছিল সম্প্রতি ২৯ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর ২০১৭ সংখ্যায় তারা একই ধরনের বিভ্রান্তির পশরা পুনরায় সাজিয়েছে। আমরা বেদনাহত চিন্তে লক্ষ্য করেছি, যে বিষয়টি ঘরে সমাধান করা যেত তা বার বার প্রকাশ্য বিতর্কের বিষয় বানিয়ে দরবার বিরোধীদের নিকট দরবারকে হাস্যস্পদ করে তোলা হয়েছে, দরবারের মান-মর্যাদাকে ‘আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক’ অপমানিত করেছে। এই দুইটি কুৎসানামায় তারা হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)’র অবস্থান ও মর্যাদাকে অস্বীকার করেছে, অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে অপমান করেছে এবং তাঁর উপর অসত্যারোপ করেছে, মাইজভাণ্ডারীসহ সমস্ত সুফি মতবাদী জনগোষ্ঠীর উপরে কুফরীর অপবাদ আরোপ করেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার বিরুদ্ধে পক্ষাবলম্বন করে ওহাবী-সালাফী গংয়ের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থকে ‘ভ্রান্ত আকীদার কিতাব’রূপে অভিযুক্ত করার ভেতর দিয়ে মাইজভাণ্ডারী নাম ধারণ করে মাইজভাণ্ডারী ঘরানার কোন কিতাবকে অস্বীকার করার প্রথমবারের মতো কলংকজনক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। বেলায়তে মোতলাকার বিকৃত সমালোচনা করেছে। বেলায়তে

মোতলাকা গ্রন্থে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী যা বোঝাতে চাননি তা-ই তাঁর নামে চাপিয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সত্যসমূহ সযতনে লুকানো হয়েছে। আমরা ‘আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক’র এই দুষ্কর্মের পুনরায় নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রিয় আশেকানে মাইজভাণ্ডারী,

উপরোক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে সপ্রমাণ বিস্তারিত বর্ণনা উদাহরণসহ আমরা ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সামনে ভবিষ্যতে উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ। তবে তার পূর্বে আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক এহেন দুষ্কর্মের প্রেক্ষাপট কি করে প্রস্তুত করল, কি করে এ ফেৎনা-ফ্যাসাদের জন্ম দিল তা আমরা আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করতে চাই।

হযরত কেবলা আলমের সময়ে তরিকার যে সংবিধানটি অলিখিত অবস্থায় চর্চিত হয়ে আসছিল, যা পরবর্তীতে খোলাফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বিবৃত হয়, তা-ই অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে তরিকার সমস্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ একত্রিত করে ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থে উপস্থাপন করেন।

হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)’র অছি হিসেবে, হযরতের পুত্রবংশীয় উপযুক্ত আওলাদ, রক্ত, আদর্শ, বেলায়ত এবং গদির উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসেবে অছিয়ে গাউসুল শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার বেলায়তের স্বরূপ উদঘাটন করেন কথায়, কাজে, লেখনীতে তথা সমগ্র জীবনাদর্শে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাহচর্য, খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাহচর্য এবং কিতাবাদী, উৎস হিসেবে গ্রহণ করে তিনি এ তরিকার ‘লিখিত মডেল’ উপস্থাপন করেন স্বীয় লেখনীর মাধ্যমে, ছোট-বড় ১২টি গ্রন্থ যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রদত্ত এই লিখিত তথ্য এবং তত্ত্ব অবনতিচিন্তে মেনে সেই অনুযায়ী আমল করাই ছিল হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)’র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নৈতিক দাবী, তরিকতের

আদব এবং ইনসাফ।

কিন্তু ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’ তরিকতের আদবের এই ঐতিহ্যকে পদদলিত করে সম্পূর্ণ অজানা কারণে ‘উসুলে সবআ’ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী’র প্রবর্তিত নয় বলে এলান: “ইদানিং মাইজভাগুরী শরীফের কিছু কিছু প্রকাশনায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ম্যাগাজিনে ‘উসুলে ছাব্বা’ বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি নামে নতুন এক কর্ম পদ্ধতি হযরত কেবলা (ক:) কর্তৃক প্রবর্তিত বলে প্রচার করতে দৃষ্টি গোছর হয়। যা গাউছুল আ’যম মাইজভাগুরী ও মাইজভাগুরী তরিকার নামে অসত্য প্রচার এ ধরনের মিথ্যা তথ্যের সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে সর্বস্তরের মাইজভাগুরী অনুসারীগণ সর্বদাই সতর্ক থাকবেন এবং সর্বাঙ্গিক মহলের প্রতিও এধরনের অসত্য প্রচারে বিরত থাকার অনুরোধ রইল। প্রচার ও প্রকাশে: গাউছুল আ’যম বাবাজাগুরী পরিষদ” (২০১৪ সালের তৃতীয় সংখ্যা হতে ‘আল মাইজভাগুরী’ ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় প্রচ্ছদ) দিয়ে অনধিকার চর্চা এবং নিজ সীমা লংঘনের এক ভয়ানক নজির সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান ফেৎনার উদ্ভব ঘটায়।

পাঠক তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, (১) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী’র আওলাদদের বাদ দিয়ে সমগ্র মাইজভাগুরী শরীফের পক্ষে এলান দেওয়ার কোনও অধিকার কারও আছে কি না? (২) তারা আরো প্রশ্ন করতে পারেন, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর তরিকার রূপরেখা সম্পর্কিত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর প্রদত্ত তত্ত্ব এবং তথ্য অস্বীকার করার নৈতিক এবং আইনগত অধিকার তাদের আছে কি না?

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, ফেৎনা সৃষ্টিকারীদের এতবড় অন্যায় সত্ত্বেও হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী এবং অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর আদর্শবাহী প্রতিষ্ঠান ‘আলোকধারা’ কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। বরং ধৈর্যের সাথে ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে ‘উসুলে সবআ’র যুক্তিবত্তা এবং বাস্তবতা ও সত্যতা প্রমাণ করে ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং তথ্যের আলোকে। এরই এক পর্যায়ে যারাই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলম প্রবর্তিত ‘উসুলে সবআ’র এই বক্তব্যের অস্বীকারকারী তাদের উদ্দেশ্যে অধিকারের প্রসঙ্গটি একপাশে রেখেই আলোকধারা একটি একাডেমিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। আলোকধারার ছোট প্রশ্নটি ছিল, ‘যদি উসুলে সবআ’র চেয়ে ভাল কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে আছে কি? থাকলে উপস্থাপন করবেন কি?’ (সূত্র: মাসিক আলোকধারা, ২৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২০)। এই প্রশ্নে ‘আল মাইজভাগুরী ডেস্ক’ এই পর্যন্ত লা জওয়াব। তারা শুধু এটুকু বলেছে যে, “খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর লিখিত কিতাব বেলায়তে মোতলাকার চেয়ে শতগুণ উন্নত (২২ চৈত্র ২০১৭, ১১০তম

বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৮)। কিন্তু সামগ্রিক ও প্রায়োগিক মাইজভাগুরী দর্শনটি কি এই বিষয়ে তারা এ পর্যন্ত নিরব। নিজেদের এই অমার্জনীয় অক্ষমতা ঢাকতে গিয়ে ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’ যে পথ বেছে নিয়েছে তা অত্যন্ত গর্হিত এবং দুঃখজনক।

২২ চৈত্র ২০১৭ সংখ্যা ‘আল মাইজভাগুরী ডেস্ক’ ‘আলোকধারা ডেস্ক’-এর লেখার প্রেক্ষাপটে ‘উসুলে সবআ’ ও ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থের স্বরূপ উন্মোচন মর্মে একটি লেখা প্রকাশ করে। উক্ত লেখায় আলোকধারার বিরুদ্ধে লেখার পরিবর্তে আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক লজ্জাজনকভাবে হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী’র ‘নবাব’ ‘সুলতান’ ‘গদির উত্তরাধিকার’ খলিফাগণ কর্তৃক উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব সর্বজন শ্রদ্ধেয় অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীকে তাদের সমালোচনার লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করে। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অসত্য আরোপ, ধর্মহীনতার অভিযোগ, অপমানজনক বক্তব্য এবং ‘বেলায়তে মোতলাকা’র বিকৃত সমালোচনা দিয়ে পৃষ্ঠা পূর্ণ করে। তাঁর আকীদাকে কুফরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করে সরাসরি হযরতের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর বিরোধিতার ফলশ্রুতিতে মাইজভাগুরীয়া তরিকার আঙ্গিনা থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের এ প্রকাশ্য অপকর্মের কারণে নিশ্চিতভাবেই তারা মাইজভাগুরীয়া তরিকার খারেজী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সকল আশেকানে মাইজভাগুরীর কাছে উন্মুক্তভাবে জিজ্ঞাস্য- “হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী’র ঘোষিত ‘নবাব’ ‘সুলতান’ খলিফাগণের ‘সানী গাউস’ ‘সানী ইমাম হোসাইন’ বাবা ভাগুরীর জামাতা এবং খলিফাকে কুফরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করে মাইজভাগুরীয়া তরিকার আঙ্গিনায় অবস্থান করা কারো পক্ষে সম্ভব কিনা?”

পাঠক, ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’ যে ‘মাইজভাগুরীয়া তরিকা’র আঙ্গিনা থেকে খারেজ তা তারা সর্বদিক দিয়ে প্রমাণ করেছে। ১৯২৪ সালে দরবার শরিফে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময়, হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাগুরী কিবলায়ে আলম যাকে তাঁর কন্যা সন্তানের জামাতা হিসেবে কবুল করেছেন, অন্য কোন গৃহের পরিবর্তে, সেই অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী’র গৃহে দীর্ঘ নয় মাস অবস্থান নিয়ে তাঁর বুয়গীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীগণ তাঁকে ‘সানী গাউসে ধন’ হিসেবে সম্বোধন করে বারংবার স্বীকৃতি দিয়েছেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী তাঁকে গদির উত্তরাধিকারী করেছেন। গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাগুরীর মত করেই,

‘সুলতান’ লকব দিয়েছেন। আর অপরদিকে ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’ বলছে, (২২ চৈত্র পৃ. ২৩): “কারণ, অভিযুক্ত করার পূর্বে গ্রন্থকারের আসল পরিচয়, গ্রন্থকারের গ্রন্থ রচনার মত এলম জ্ঞানের যোগ্যতা এবং লিখিত গ্রন্থটি মাইজভাগুরী দর্শন হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কিনা? তা একান্ত জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। একথা আপনাদের অবশ্যই জানা আছে বেলায়তে মোতলাকার লেখকের ৯ বৎসর বয়সে তার পিতা এবং ১৩ বৎসর বয়সে দাদা হযরত বেছাল হন। তৎসময়ে তিনি হিরজ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার মত বয়সে পৌছাননি। এ সময়ে তাঁর দাদা হযরত গাউছুল আযম মাইজভাগুরী (ক:) কর্তৃক উপদেশ বাণী তাঁর কার্যকর্ম উপলব্ধি করে মাইজভাগুরী দর্শন জানা ও লেখার মত শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করেননি, বায়াত, মুরিদ খেলাফত অর্জনের কথা তো প্রশ্নই আসেনা।”

এখন পাঠক, সচেতন বিবেক, বিচার করুন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী, হযরত বাবা ভাগুরী এবং খলিফাগণের সিদ্ধান্ত সঠিক? নাকি তাঁদের সিদ্ধান্তকে অস্বীকারকারী আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক সঠিক? সিদ্ধান্ত আপনাদের বিবেকের কাছে। পাঠকের কাছে আমরা জানতে চাই, আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’র ‘মাইজভাগুরীয়া তরিকা’র মূল হস্তীগণের বিপরীত অবস্থান গ্রহণের পরিণতি কি?

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী, হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাগুরী, খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর প্রশংসাবাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর প্রতি কুফরী আকীদা অবলম্বনের অভিযোগ (সূত্র: আল-মাইজভাগুরী ম্যাগাজিন, ৫ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যা, পৃ. ১৭) দিয়ে আল মাইজভাগুরী ডেস্ক হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর পবিত্র কালামকে অস্বীকার করেছে, বাবা ভাগুরীর স্বীকৃতিকে অস্বীকার করেছে, খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর স্বীকৃতিকে অস্বীকার করেছে। যার ফলাফল স্বরূপ ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’ ‘গোস্তাখে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী’ ‘বেয়াদবে হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাগুরী’ তথা নিশ্চিতভাবেই ‘মুনকেরে মাইজভাগুরী’তে পরিগণিত হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে আমাদের বক্তব্য বোঝার সুবিধার্থে খলিফায়ে গাউসুল আযম আল্লামা আমিনুল হক হারবাজিরী (রঃ)র ‘ওফাতনামা’ ও আল্লামা বজলুল করিম মন্দাকিনী (রঃ)র ‘প্রেমাঞ্জলী’ হতে দু’টি কালামের ক’টি অন্তরা আমরা উপস্থাপন করতে চাই।

ওফাতনামা: বারে বারে বলিয়াছে গাউস মাইজভাগুরী
শাহা দেলাওর সত্য ও সত্য পাইব ফকিরী
সত্য বিনে মিথ্যা না হইব কদাচন
অসত্য হইব কেনে অমৃত বচন।

প্রেমাঞ্জলী: দেখে লও কুদরতেরি শান
ত্রিগতের নয়নজ্যোতি দেলা বাবাজান।
গাউস ধনের নয়নমনি, এমাম হোসাইন সানী
শশীমুখ দেখতে সবে, ফেটে যায় প্রাণ। ঐ
তিনি যারে দয়া করে, গাউস ধনে চায় তারে
মওলানাজি বাসে ভাল পাছে পরিদ্রাণ। ঐ
বাবাজির দুই চরণ, সবিনয় নিবেদন
করিমেরে দয়া কর, বাবা দোজাহান। ঐ

এখন যদি আমরা অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীকে ভ্রান্ত বলে আর আল মাইজভাগুরী ডেস্ক’র মন্তব্যকে সত্য বলে গ্রহণ করি, তাহলে ধরে নিতে হবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর ‘অমৃত বচন’ মিথ্যা (নাউজুবিল্লাহ)।

প্রিয় আশেকানে মাইজভাগুরী, আপনারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এহেন জঘন্য অপবাদ প্রদানের মাধ্যমে যারা মাইজভাগুরী আঙ্গিনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদেরকে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছে, নিশ্চিতভাবে তাদের গন্তব্যও একই অবস্থানে গিয়ে পৌছাতে বাধ্য।

প্রিয় আশেকানে মাইজভাগুরী, আমরা বলেছি, ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’ সমগ্র মাইজভাগুরী পরিমণ্ডলকে কুফরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। আমরা এও বলেছি যে, আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক আকীদায়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মুখালিফ হয়েছে, আমরা এও বলেছি, আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর অবদান-মর্যাদাকে অস্বীকার করেছে। এছাড়াও আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক তাদের উল্লিখিত দু’টি সংখ্যায় দুই কিস্তির লেখায় আরো বহুবিধ বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করেছে। তারা এ বিভ্রান্তির জাল যতই বিস্তার করুক না কেন, কুরআনিক বিচারে চূড়ান্তভাবে তা হবে অন্তসারশূন্য। পাক কুরআনে আল্লাহ তায়ালায় ঘোষণা: “যাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি ইহারা জানিত (সূরা আনকাবুত : আয়াত ৪২)”।

পাঠক, আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’র বিভ্রান্তির জাল এই দুই সংখ্যাতে সীমাবদ্ধ নয়। ২০১৩ সাল থেকে নবপর্যায়ে আল মাইজভাগুরী ম্যাগাজিনের যে যাত্রা, সেই সময় থেকেই তারা ধাপে ধাপে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এসেছে ধারাবাহিকভাবে। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য আল মাইজভাগুরী ম্যাগাজিন থেকেই আমরা উপস্থাপন করবো

ধারাবাহিকভাবে। তবে এই কিস্তিতে আমরা আল-মাইজভাগুরী ম্যাগাজিনের দুই সংখ্যা (২০১৭ সালের ২২ চৈত্র এবং ২৯ আশ্বিন সংখ্যা) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আল মাইজভাগুরী ডেস্ক কিভাবে মাইজভাগুরী পরিমন্ডলকে কাফের বানিয়েছে তার বিস্তারিত প্রমাণাদি উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ।

কুফুরী লাজেম অপবাদ প্রসঙ্গ

ঈমান, একজন মুসলমানের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন ঈমানদার মানুষের জন্য পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ অপমানজনক শব্দ হলো বেঈমান বা কাফের ফতোয়া।

আউলিয়া-ই কিরাম, সুফিয়া-ই কিরামের মূল মিশনই ছিল মানুষের মনে ঈমানের আলো ছড়ানো এবং ঈমান সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর অন্যথা যারা করে, এর বিপরীতে যায়, তারা শয়তানের দোসর, অভিশপ্ত এবং মালাউন (যাকে লানত দেওয়া হয়েছে)।

আল মাইজভাগুরী ডেস্ক তাদের ৫ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায় ভাববিভোর সুফিয়া-ই কিরামের বক্তব্য প্রচারকে ‘কুফুরী লাজেম’ ফতোয়া দিয়েছে। এই অবৈধ অভিশপ্ত তথাকথিত ফতোয়ার ভিতর দিয়ে তারা সাধারণ আশেকানে মাইজভাগুরী, মাইজভাগুরী পরিমন্ডলের আওলাদে পাকগণ, খোলাফায়ে মাইজভাগুরী সহ সমস্ত আওলাদে খোলাফায়ে মাইজভাগুরীগণকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের এই অভিশপ্ত তথাকথিত ফতোয়ার পরিণামে সুফি আকাবেরগণ সহ সাহাবা-ই কিরাম পর্যন্ত কাফেরে পরিগণিত হয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ ...)। কারণ রাসূল করিম (সাঃ) থেকে সাহাবা-ই কিরামের মাধ্যমে সুফিগণের ধারাবাহিকতায় অগণিত ভাববিভোর বাণী প্রচারিত হয়ে এসেছে। হাদিস শরিফ এবং সুফিয়া-ই কিরামের বাণী হিসেবে যা আজও সমানতালে প্রবহমান।

‘আল মাইজভাগুরী ডেস্ক’র এই অপরিণামদর্শী, আত্মঘাতী অপকর্মের ফলশ্রুতিতে মাইজভাগুরীয়া তরিকার অনুসারীগণ এক বিপুল বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ওহাবী সালাফিরা উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

এখন প্রশ্ন, মাইজভাগুরী নাম ধারণ করে মাইজভাগুরীয়া তরিকা বিরোধী এহেন জঘন্য ফতোয়া প্রদানের অধিকার তাদের কে দিল? এই ভয়াবহ কলংকজনক অপকর্মের জন্য ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’কে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ইতিহাস তাদের ধিক্কার জানাবে। চিরধিকৃত হতে হবে যুগ যুগ ধরে।

উদ্ধৃতি: আল-মাইজভাগুরী ২২ চৈত্র ২০১৭, ১১০তম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৬:

“কথা হচ্ছে, আলি বুজুর্গর মকবুল হাল ফানা ফিল্লাহ অবস্থার কিছু রূপক কালাম যা সাধারণের সহজে বোধগম্য হয়না, যা

তাদের নিজের দাবীর পক্ষে প্রযোজ্য, যা সাধারণ লোকে বলা ও প্রচার করা উভয়ে কুফুরী। যেমন: সুলতানুল মাশায়েখ হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (ক:) প্রায় সময়ে বলতেন “আনা ছোবহানী মা আজিমুশ শানী” আবার কোন কোন বুজুর্গ ফানা-ফির রাসূল মকামে পৌঁছে দাবী করতে দেখা যায় “রহমাতুল লিল আলামীনের সীমানা জুড়ে আমার ক্ষমতা” অর্থ রাসূল (দ:) এর যে ক্ষমতা আমারও সেই ক্ষমতা। এ সমস্ত রহস্য পূর্ণ জটিল কালাম সমূহ মকবুল হাল বিশিষ্ট আল্লাহর মাহাবুব অলিদের জবানে প্রকাশ প্রযোজ্য, কারণ তাঁরা এমতাবস্থায় এ ধরনের কালাম করেন, যখন তাঁরা নিজেকে হারিয়ে ঐ পরম সত্তা জাতের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যান। কিন্তু এ ধরনের কালাম সাধারণের মুখে প্রচার ও প্রকাশ পেলে তার প্রতি কুফুরী ফতোয়া লাজেম হবে। একই ভাবে হযরত গাউছুল আযম আহমদ উল্লাহ (ক:) ও হযরত গাউছুল আযম বাবাভাগুরী (ক:) বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের রহস্যপূর্ণ বাক্যলাপ করতেন। যা তাদের জবানে প্রকাশ প্রযোজ্য কিন্তু অনুসারীদের প্রকাশ ও আমল যোগ্য নয়।”

আল-মাইজভাগুরী ডেস্কের উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা বোঝা গেল, আল মাইজভাগুরী ডেস্ক দাবী করেছে- ‘অলী বুয়র্গগণের রূপক কালাম যা সাধারণের সহজে বোধগম্য হয়না, তা সাধারণ লোকে বলা ও প্রচার করা উভয়ের জন্য কুফুরী ফতোয়া লাজেম হবে। এবং এই বুয়র্গগণের মধ্যে আল মাইজভাগুরী ডেস্ক সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী, হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী এবং গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাগুরী কেবলা আলমের রহস্যপূর্ণ বাক্যলাপসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এই বাক্যলাপসমূহের প্রচারকে কুফুরী ফতোয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।

পাঠক আসুন ‘আল মাইজভাগুরী ডেস্ক’র এই বক্তব্যটি আমরা পরীক্ষা করে দেখি। বাস্তবতা হচ্ছে, হযরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামীর যেই বাক্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেই মহান বাণীটি যুগে যুগে অসংখ্য আকাবেরীন, আউলিয়ায়ে কেরাম কর্তৃক প্রচার এবং প্রকাশ, সাধারণ জনগণের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’র কাছে পৌঁছেছে। ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’র বক্তব্য অনুযায়ী এই বাণী প্রচার করা যদি কুফুরী হয়ে থাকে, তাহলে এই বাণী বিগত শত শত বছর ধরে প্রচারের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ তরিকতপন্থী সুফিপন্থী মুসলমানগণ কাফিররূপে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কারণ ওহাবী-সালাফীগণ ছাড়া সমস্ত আহলে তাসাওউফ, আহলে তরিকত পন্থী মুসলমানগণ এই বাণীসমূহকে ইসলামের পবিত্র আমানত হিসেবে বহন করে এসেছে।

পাঠক, আসুন মাইজভাগুরী আঙ্গিনায় আমরা এই বাণীসমূহের

ব্যবহারবিধি একটু নিরীক্ষণ করি।

শাহজাদা সৈয়দ বদরুদ্দোজা মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক রচিত ‘অলিকুল শিরোমনি বাবা ভাণ্ডারী’ নামক পুস্তকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের ৪ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, ‘ভক্তি ও প্রেম দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া সহজতর। এই প্রেম দ্বারাই মহর্ষি হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ ‘আনাল হক’ বলিতে সাহস পাইয়াছিলেন’। আল মাইজভাণ্ডারী ম্যাগাজিনের ২০১৩ সালের প্রথম সংখ্যা ৮ পৃষ্ঠায় শাহজাদা সৈয়দ আবুল বশর মাইজভাণ্ডারী লিখিত ‘আগমনী-১’ প্রবন্ধে উল্লেখিত আছে, বায়জিদ বোস্তামীকে লক্ষ্য করে জনৈক অলি বলেন, ‘যখন তুমি আমাকে দেখিলে তখন খোদাকে দেখিলে এবং কাবার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিলে’।

এখন ‘আল মাইজভাণ্ডারী’র আকীদা অনুযায়ী সাধারণের জন্য প্রচারিত এই ‘ভাববিভোর’ বাণীসমূহ প্রচারের কারণে আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক নিশ্চয় উক্ত দুই শাহজাদাকে কাফের বলে অভিহিত করবে। শুধু তাই নয়, অগণিত মাইজভাণ্ডারী কালামে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা এবং হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার এবং অসংখ্য আওলিয়ায়ে কেরামের ‘ভাববিভোর’ বাণী শ্রবণে শতবছর ধরে অগণিত আশেককূল যে মাহফিলে ‘অজদপূর্ণ জিকির’ করেছে ‘আল মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক’র ফতোয়া মোতাবেক তারা সকলেই কাফের (নাউজুবিল্লাহ)।

প্রিয় আশেকানে মাইজভাণ্ডারী, এই ধরনের ভয়ানক ফতোয়া জারী করে ‘আল-মাইজভাণ্ডারী গোষ্ঠী’ ‘তাক্ফিরী ওহাবী-সালাফী গোষ্ঠী’র মনোরঞ্জন করতে সফল হয়েছেন বটে, তবে মাইজভাণ্ডারী আঙ্গিনায় তাদের অবস্থান আর রয়েছে কিনা তা বিবেচনার ভার আমরা সচেতন আশেকানে মাইজভাণ্ডারীদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

দ্বিতীয়ত, হাদিস শরিফে সুস্পষ্ট রয়েছে, কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তিকে দূরাচারী কাফির বলা সংশ্লিষ্ট উক্তি নিক্ষেপ না করে। কেননা সে ব্যক্তি ঐরূপ না হলে তা উক্তিকারীর উপরেই এসে পড়বে (সূত্র: বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯৩ পৃ.)। এখন যে মৌলিক প্রশ্নের ফয়সালা করা জরুরী তা হল, হয় আল মাইজভাণ্ডারী ডেস্কের ফতোয়া মোতাবেক সমস্ত আকাবেরীন-ই কিরাম, মাইজভাণ্ডারী মাশায়েখ, আওলাদ, আশেক-ভক্তগণ উক্ত বাণীসমূহ প্রচারের কারণে কাফের হবেন, অন্যথায় হাদিস শরিফ অনুযায়ী এই ফতোয়া ফেরত যাবে ফতোয়াদানকারীর দিকে। এই ব্যাপারে আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্কের বক্তব্য জানতে আমরা আগ্রহী।

তৃতীয়ত, যে উক্তি বা বক্তব্য কুরআনের নয়, আল্লাহর কালাম নয়, তা আল্লাহর কালাম হিসেবে প্রচার করা সর্বোত্তমভাবেই গোমরাহী। আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক ৩য় সংখ্যা ২০১৪ পৃ.

৯-এ লিখেছে, ‘আল্লাহ বলেছেন- “আহুছায্যু মিন্নি ওয়া ইতমামুমিনায়াহ”। সত্য হচ্ছে, উক্ত বক্তব্যটি কুরআনের কোন আয়াত শরিফ নয়। এটি একটি প্রচলিত আরবী প্রবাদ মাত্র, যা কওমী মাদ্রাসায় পাঠ্য ‘রওয়াতুল আদব’ বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। কুরআন পাকের ভাষায়- “ফামান আজলামু মিন্মানিফ তারা আলাল্লাহি কাজিবান আওকাজ্জাবা বি’আয়াতিহি ইল্লাহ লা ইয়ুফলিহুল মুজরিমুন”।

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? নিশ্চয়ই অপরাধিগণ সফলকাম হয়না (সূরা ইউনুস, আয়াত-১৭)।

খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মকবুলে কাঞ্চনপুরীর ভাষায়, “আউলিয়াগণের সাথে বেয়াদবি থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। সত্যই যখন ভাগ্যমন্দতা মুখ দেখায় তখন এই পরিণতিই হয়। যখন ললাটের লিখন বাস্তবায়িত হতে চলে তখন চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। যখন কারো দূর্ভাগ্য উপস্থিত হয় তখন সে নিজ অপেক্ষা সম্মানিত ও শীর্ষ স্থানীয়দের সাথে বেয়াদবি করে” (আয়নায়ে বারী পৃ. ১৭০)। সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে মিথ্যা রচনার কারণে ‘আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক’র কি পরিণতি হওয়া উচিত তা আমরা সমস্ত উলামায়ে কিরাম এবং আশেকানে মাইজভাণ্ডারীগণের বিবেচনার উপরে ছেড়ে দিতে চাই। আমরা আল মাইজভাণ্ডারী ডেস্কের এই জঘন্য অপকর্মের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত পাঠক, বর্তমান কিস্তিতে ‘আল মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক’ কর্তৃক সৃষ্ট ফেৎনার পটভূমি আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে কুফরী আকীদা অবলম্বনের মাধ্যমে তারা যে মাইজভাণ্ডারী আঙ্গিনা থেকে খারিজ হয়ে গেছেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং প্রমাণ হাজির করেছি। আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্কের অগণিত অপকর্মের মধ্য হতে সমগ্র মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলকে কুফরী অপবাদ প্রদানের প্রসঙ্গে আমরা সপ্রমাণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। আগামী কিস্তিসমূহে আমরা আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক’র আকীদায়ে আহলে সুন্নাত খেলাফকারী বক্তব্যসমূহ এবং ‘গোস্তাখে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা’ সম্বন্ধীয় বক্তব্যসমূহ সপ্রমাণ উপস্থাপন করার আশা পোষণ করছি।

প্রিয় পাঠক, মনোযোগের সাথে এ রচনাটি পঠনের জন্যে আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ।

‘ঐতিহাসিক লালদীঘি’ ময়দানে প্রকাশ্য মোনাজেরার আহ্বান

২৯ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর ২০১৭ সংখ্যায় আল-মাইজভাগুরী ম্যাগাজিনে উল্লেখিত মোনাজেরা’র বিষয় আমাদের গোচরে এসেছে।

উক্ত ম্যাগাজিনে কিছু শর্তারোপের মাধ্যমে তারা ‘আলোকধারা ডেস্ক’কে উন্মুক্ত মোনাজেরার আহ্বান করেছে। বস্তুতপক্ষে মতবিরোধ নিরসনের উপায় হিসেবে মোনাজেরা একটি বিগত শতাব্দীর বিষয়। মুসলিম বিশ্বসহ সমস্ত আধুনিক বিশ্ব বর্তমানে মতবিরোধ আলোচনার জন্য গোলটেবিল আলোচনা এবং অতপর প্রশ্নোত্তর পর্বকে বেছে নেওয়া হয় সর্বসম্মতভাবে।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কোন এক আলেমের মোনাজেরা আহ্বানের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন, “তিনি মুসব্বী তুরীকার লোক খিজিরী কাজ কারবার তিনি কি বুঝিবেন? তোমরা ফাছাদ ও বাহাছ করিও না। আপন হালতে থাকিয়া যাও। তাহারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।” (সূত্র: জীবনী ও কেরামত, ২৪তম সংস্করণ, পৃ. ১৭১)

হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর এই ফয়সালাকে, “সংঘাত নয়, সংলাপ” এই নীতিতে আমরা অবনতিচিহ্নে অনুসরণ করে থাকি সচরাচর।

আবার খোলাফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীগণের জীবন পর্যালোচনায় দেখা যায়, কোন কোন সময় বিশেষ অবস্থায় এই মোনাজেরায় সাড়া দেওয়া কল্যাণকর বলে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় ‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’র এই আহ্বানের প্রেক্ষিতে এই দুইটি মাইজভাগুরী উসুলকে আমাদের চেতনায় ধারণপূর্বক আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্য উদঘাটনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আল-মাইজভাগুরী ডেস্কের মোনাজেরার প্রস্তাবকে নিম্নোক্ত শর্তে গ্রহণ করছি:

(১) খাতেমুল ওলী, মাইজভাগুরীয়া তরিকার প্রবর্তক এবং পরিপূর্ণরূপদানকারী, গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরীর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান, শান-মান নিয়ে নানা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন, অসত্য বক্তব্য দিয়ে আল-মাইজভাগুরী ম্যাগাজিন অহরহ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

[খাতেমুল অলি প্রসঙ্গ: (আল-মাইজভাগুরী ৫ এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ২০), মাইজভাগুরীয়া তরিকার প্রবর্তক: (৫ এপ্রিল ২০১৩ সংখ্যা পৃ. ১২), তরিকার পরিপূর্ণরূপদানকারী: (আল-মাইজভাগুরী ৫ এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১৩)]

একইসাথে অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী’র বিষয়েও সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে চলেছে। যেমন: (১) অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীকে মাজার শরিফের সম্পত্তির অশহীদারিত্বে পুনর্বাসন করা হয়েছে (আল-মাইজভাগুরী ৫ এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১৭)। এর পাশাপাশি তাঁর খেলাফত, বেলায়তকে অস্বীকার করা হয়েছে। (আল-মাইজভাগুরী ৫ এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ২৩)।

এ সমস্ত স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা বক্তব্য থেকে ফেরৎ আসার জন্য পরামর্শ জানাচ্ছি এবং উক্ত বক্তব্যসমূহ প্রত্যাহার না করলে মোনাজেরার আহ্বান জানাচ্ছি।

পাশাপাশি উল্লেখ করতে চাই, উক্ত মোনাজেরায় শুধু আওলাদগণ অংশগ্রহণ করবেন। ‘আলোকধারা’র সম্মানিত প্রকাশক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ চাহেতো মুনিবের মেহেরবানীতে এ ব্যাপারে তিনি একাই যথেষ্ট এবং ‘আলোকধারা ডেস্ক’র পক্ষ থেকে উক্ত মোনাজেরায় তিনি একাই উপস্থিত থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

আরো উল্লেখ করতে চাই, যেহেতু মোনাজেরা আহ্বানকারীদের মধ্যে একজন বর্তমান সংসদ সদস্য রয়েছেন, আমরা মনে করি, চলমান সামাজিক বাস্তবতায় বিচারকগণ এতে প্রভাবিত হতে পারেন। তাই আমাদের পরামর্শ, সংসদ সদস্য যেন পদত্যাগ করে মোনাজেরায় উপস্থিত থাকেন। যদি কোন কারণে তিনি এখন পদত্যাগে সক্ষম বা সম্মত না হন, তাহলে আগামী নির্বাচন চলাকালীন যে কোন সময় আমরা উন্মুক্ত মোনাজেরার জন্য সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত আছি।

‘আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক’ ‘মাইজভাগুরী শাহী ময়দান’এ মোনাজেরার স্থান নির্ধারণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো- হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা কাবা ও হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাগুরী কেবলা কাবার সামনে বাকবিতণ্ডার এই আগ্রহকে আমরা ‘দরবারের মর্যাদা হানিকর’ বলে মনে করছি। তদুপরি যেহেতু আল-মাইজভাগুরী ডেস্কের আগ্রহ এই উন্মুক্ত মোনাজেরায় সাধারণ মানুষজনসহ ‘তামাসগীরগণ’ অবলোকন করুক, তাই ‘দরবার শরীফ শাহী ময়দান’র আদব রক্ষাপূর্বক ব্যাপক সংখ্যক লোক যাতে মোনাজেরার বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারেন, সেই বিবেচনা থেকে প্রকাশ্য স্থান হিসেবে আমরা চট্টগ্রাম নগরীর ‘ঐতিহাসিক লালদীঘি’ ময়দানের নাম প্রস্তাব করছি। তবে শর্ত থাকে যে, এই মোনাজেরায় ‘আলোকধারা’ প্রকাশকের বিপরীতে ‘আল-মাইজভাগুরী ম্যাগাজিন’ প্রকাশক মণ্ডলীর সকল সদস্যকে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে।

সাথে সাথে এও জানিয়ে দিতে চাই, আমাদের অনুসৃত নীতি অবলম্বনে গোলটেবিল বৈঠকের জন্যও আমরা সদা-সর্বদা পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত। এ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

‘আলোকধারা’ কার্যালয়

গাউসিয়া হক ভাগুরী খানকাহ শরিফ

সৈয়দ সলিমুল্লা শাহ রোড

বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১।

মোবাইল: ০১৮৭২-২৮৮৬৫৫ (অফিস চলাকালীন সকাল

১০টা হতে বিকেল ৫টা)

গাউসুল আযম মাইজভাগুরী'র 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের বিবৃতি

[হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ)'র প্রতি বিদ্বেষপরায়ন চিন্তাভাবনার যে প্রমাণ 'আল মাইজভাগুরী ডেস্ক' রেখেছে, তাদের ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায় দিয়েছে, তা নতুন কিছু নয়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা কাবার মর্যাদাকে খাটো করার তাদের এই অপপ্রয়াস অতীতের কিছু ধারাবাহিকতা মাত্র। আমাদের এই বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ ১৯৬৭ সনে অছিয়ে গাউসুল আযম মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী কর্তৃক সংকলিত ও মৌলানা মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া লিখিত 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশ পাঠকদের অবগতির জন্যে পেশ করছি।]

আজ আমার সংগৃহীত নোটমূলে জনাব মৌলানা ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া নিজামপুরী গোল্ডমেডেলিষ্ট সাহেব কর্তৃক লিখিত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (কঃ) এর "জীবনী ও কেরামত" নামক গ্রন্থখানি দর্শনে সন্তুষ্ট হইলাম। যাহার সত্যতা ও সততা সম্বন্ধে আমার আস্থা আছে।

মৌলানা সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ইছাপুরী সাহেব রচিত "হযরত শাহ মাইজভাগুরী" নামক গ্রন্থটির প্রথম খন্ড অসম্পূর্ণ অবস্থাতে ছাপানো হইয়াছিল। তাহাও আবার "আয়নায়ে বারী" অনুকরণে মসায়েলা মসায়েল বহুল বলিয়া তাহা জীবনীর সারল্য হারা ছিল। বর্তমানে হযরত কেবলার জীবনীটি সেই দিক দিয়াও পছন্দসই।

উক্ত মৌলানা ইছাপুরী সাহেব লিখিত হযরত গাউসুল আযম মাওলানা আল সৈয়দ গোলাম রহমান আল হাছানী আল মাইজভাগুরী বাবাজান কেবলা কাবার (কঃ) জীবন চরিত নামক গ্রন্থখানি পাঠে দেখিতে পাইলাম হযরত কেবলা শাহসুফী গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাগুরীর নাম উঠেমেখে তিন চারিটি রেওয়াজত মারাত্মক ভুল, পরিকল্পিত এবং অপবাদমূলকভাবে সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

(ক) যেমন উক্ত জীবন চরিতের ২২ পৃষ্ঠায় ৭ম লাইনে লেখা আছে, "আমার সমস্ত বাগান খুজিয়া দেখিলাম, কোথাও একটি গোলাপ ফুল খুজিয়া পাইলাম না", অথচ সেই সময় হযরতের ফয়েজ বরকত ও কামালিয়ত পর্যাণ্ত বহু লোক বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারা এই দেশে সুপরিচিত। তাঁহাদের চালচলন ও খোদা আসক্তি দর্শনে এই মাইজভাগুর শরীফের দিকে সাধারণ লোকেরাও ঝুঁকিয়া পড়ে।

এই ইছাপুরী সাহেব "হযরত শাহ মাইজভাগুরী" নামক গ্রন্থে নিজেই লিখিয়াছেন, তাহার চাচা মরহুম সাবরেজিষ্টার জনাব সৈয়দ ফোরক আহমদ সাহেবকে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) বলিয়াছিলেন, "তোম হামারা বাগকে গোলে গোলাব হো"। মাওলানা সাহেবের এই 'স্ববিরোধী' কথার মধ্যে কোন মিল দেখা যায় না। পক্ষান্তরে তাঁহার এই 'বানাওয়াটি' কথার দ্বারা হযরত কেবলার বেলায়তের উপর বিরাট ধাপ্লা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হযরতের বেলায়তে যুগটি অনর্থক ও অকেজো। কোন প্রস্ফুটিত মানুষ সেই যুগে গড়িয়া উঠে নাই। এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও

উদ্দেশ্যমূলক। হযরতের বেলায়তের দ্বারা এই পূর্বে দেশবাসীরা যে উপকৃত এবং ছাহেবেহাল ও জজবার অধিকারী, তাহা এই দেশবাসী একবাক্যে স্বীকার করে এবং বুঝে (বেলায়তে মোতলাকা বা মুক্ত সুফীবাদ এবং আয়নায়ে বারী দ্রষ্টব্য)। এই জীবনী দ্বারাও মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কোন ধরনের অলি উল্লাহ। ইহা ছড়াও বহু পুস্তক-পুস্তিকা আছে যাহাতে তাহার শানের গান গজল লিপিবদ্ধ এবং তাঁহার শান বর্ণিত আছে (রত্ন ভান্ডার দ্রষ্টব্য)।

মৌলানা ইছাপুরী সাহেব লিখিত ঐ জীবন চরিতের ৪৭ পৃষ্ঠায় ১২শ লাইনে আছে, শাহ আবদুল মজিদ আজিম নগরী (রঃ) হযরতের খেদমতে হাজির হইয়া হযরত বাবাজান কেবলার (কঃ) শানে বাক্যালাপ করিলে হযরত আকদাস (কঃ) তাহাকে বলেন, "মিঞা উহ শাহে জালাল হয়। মূলকে এমনকা রাহনে ওয়ালা হয়। উনকো আদব করো। তোম লোগাকে এবতেদা আওর এনতেহা উনহিকে হাতমে হয়"। ইছাপুরী সাহেব লিখিত উপরের বাক্যগুলি সেইরূপ এক বিকৃত বর্ণনা, তদ্রূপ উদ্দেশ্যমূলক এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উক্তি।

(ক) আবদুল মজিদ মিঞা হযরত কেবলার আত্মীয় এবং হযরত কেবলা তাহার পীরে ত্বরিকত ছিলেন। কাহারো শেকায়েতমূলক গল্প গুজব বে-আদবী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতেন। তিনি সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না বরং হযরতের ফয়েজ প্রাপ্ত সাহেবে তছরুফ লোক ছিলেন। এমন কি তিনি যাহাকে হালকা জজবার সময় স্পর্শ করিতেন তাহারও হাল জজবা গালেব হইত। যাহারা তাহাকে জানেন, তাহারা নিশ্চয় ইহা স্বীকার করিবেন। ফয়েজ দানে হযরত কেবলা তাহাকে খেলাফত দিয়াছিলেন যাহা সকলে স্বীকার করিত। ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মন্দাকিনী, ধলই, ফরহাদাবাদ, গুয়াবিল, দৌলতপুর বাবুনগর, আজিম নগর, মাইজভাগুর ও নানুপুর মৌজার আবাল বৃদ্ধ বণিতা তাঁহার তছরুফ সম্বন্ধে নিশ্চয় ওয়াকেফহাল আছেন। এহেন অবস্থাতে উক্ত শাহ সাহেবের এবতেদা অর্থাৎ গুরু, এনতেহা অর্থাৎ শেষ, বাবাজান কেবলার হাতে কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝার উপায় নাই। ইহা এমন এক উক্তি, যাহার কোন যুক্তি নাই।

প্রকৃত ঘটনা এইরূপ : আঁ-হযরত কেবলা কাবার দায়রা শরীফের সোজা দক্ষিণ দিকে মধ্যখানে একটি "দর" বা বাহির উঠানে আসার পথ বাদ সৈয়দ মোং আবদুল করিম সাহেবের

যেই কাছারী ঘর ছিল, তাহাতে ছোট মৌলানা শাহসুফী সৈয়দ আমিনুল হক কুতুবে এরশাদ ওয়াছেল মাইজভাগুরী সাহেব মুরিদান এবং পীরভাইগণ সহ হালকা জজ্বা করিতেন ও করাইতেন। আমরাও সেই ঘরে হাজির হাইতাম ও তাঁহার তালিম নিতাম। তিনি উপস্থিত হইতে না পারিলে উক্ত আবদুল মজিদ মিঞাকে তালিম দিবার হুকুম দিতেন। একদা বাদে মাগরিব, নামাজান্তে নিয়মিত হালকা জজ্বার মজলিশ বসিলে, ছোট মৌলানা সাহেবের অনুপস্থিতিতে আবদুল মজিদ মিঞা মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পাশে বসিয়াছিলাম। এই কাছারী ঘরখানাকে হযরত কেবলা দপ্তরখানা বলিতেন। হযরত আকদাস লোক বিশেষকে কোন কোন সময় বলিতেন, ‘দপ্তরখানায়’ আমার আমিন মিঞার কাছে গিয়া বস।

এইদিকে গান বাজনা সহ হালকা জজ্বার মজলিশ চলিতেছিল। এমন সময় ঘরের উত্তর পাশের দরজা দিয়া জনাব বাবাজান কেবলা কাবা জালালিয় অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতঃ “থাক” অর্থাৎ বাতি রাখার গাছ বিশেষ দিয়া আবদুল মজিদ মিঞার মাথায় আঘাত করিয়া পূর্ব দরজা দিয়া বাহির হইয়া যান। ফলে ঘরটি বাতির অভাবে অন্ধকার হইয়া যায় এবং মজলিস ও ভঙ্গ হয়।

আবদুল মজিদ মিঞা হাউ হাউ রব করিতে করিতে হযরাতের আন্দর হুজরা শরীফের দিকে হুজুর সকাশে অগ্রসর হইলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। সামনে যাইতে না যাইতেই হযরত কেবলা বলিতে লাগিলেন, “শোর করে কে”? লাভু নামে এক বৃদ্ধ খাদেম বলিল, “হুজুর আবদুল মজিদ মিঞা শোর করিতেছেন”। এই অবসরে আবদুল মজিদ মিঞা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হুজুর! খুইল্যার ছেলে আমাকে খুন করিয়াছে”। হযরত কেবল তাহাকে সান্তনা দিলেন এবং মাথায় তৈলপট্টি দিবার জন্য খাদেমকে হুকুম দিলেন। হযরত কেবলা আবদুল মজিদ মিঞাকে বলিলেন, “ভাই? উহ সাহেবে জালাল হয়। মূলকে এয়ামন মে রাহাতা হয়, আলমে আরওয়াহ মে ছায়ের করতা হয়। আপতো হামারা ছাত রহিয়েগা; উনকে পাছ কেউ গেয়া?” জনাব বাবাজান কেবলা এইরূপ “জালালী” অবস্থায় যাহাকে সামনে পাইতেন তাহাকে প্রহার করিতেন। এমন কি একদিন তাঁহার পিতা মৌং সৈয়দ আবদুল করিম সাহেবকেও প্রহারে রক্তাক্ত করিয়াছিলেন। কোনরূপ বাহ্যিক লোকাচারী লোহাজ করিতেন না বরং হাল জজ্বা ছোকর গালেব অত্যধিক প্রকাশ পাইত।

(খ) উক্ত জীবন চরিতের ৪৮ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে লিখা আছে; বোয়ালখালী থানার চরণদ্বীপ নিবাসী মৌলানা আছিয়র রহমান (রঃ) বহু বৎসর যাবত হযরত আকদাছ (কঃ) এর খেদমতে ছিলেন। অবশেষে হযরত আকদাছ (কঃ) তাঁহাকে বলেন, “তোমহারে নেয়ামত পীরানে পীর সাহেবকে হাতমে হয়, তোম উনকে পাছ যাও”। এই উর্দু বাক্যটি যেমন উদ্ভট তেমন অস্বাভাবিক। যেহেতু মৌলানা আছিয়র রহমান সাহেব হযরতের প্রথম খলিফা এবং ফয়েজ প্রাপ্ত কামেল অলিউল্লাহ। জনাব বাবাজান কেবলা ফয়েজপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি (জনাব আছিয়র রহমান) খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং বাড়িতে গিয়া গদীনশীন হওয়ার হুকুম প্রাপ্তও হন। দাদী আন্মা বলিতেন, নানুপুরের-খুইল্যা মিঞা ফকীর, রাউজানের ওয়ালী মস্তান,

সাতকানিয়ার জাফর আলী শাহ, চরণদ্বীপের মৌলানা আছিয়র রহমান শাহ হযরত কেবলার প্রথম অবস্থার মুরিদ এবং ফয়েজ প্রাপ্ত। এই মৌং আছিয়র রহমান সাহেবই গদীর হুকুমপ্রাপ্ত, হযরতের প্রথম খলিফা। বাড়িতে গিয়া গদীতে বসার পর মাত্র একবারই তিনি দরবার শরীফ আসিয়াছিলেন। তাহাও হযরত কেবলার ওফাতের ১৬/১৭ দিন পূর্বে সেই সময় শীতের মৌসুম ছিল। আমি সেই সময় একদিন প্রাতঃকালীন পড়া শেষ করিয়া গোছলের পূর্বে উত্তরের উঠানে খেলিতে আসিয়া হঠাৎ দক্ষিণ দিকে নজর করিতেই মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। যেন হযরত কেবলা দক্ষিণমুখী হইয়া উঠানে শীতকালীন রোদ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে কিছু সুস্থ বলিয়া মনে হইল। তাড়াতাড়ি দক্ষিণ দিকে সম্মুখে আসিলেই আমার ভুল ভাঙ্গে। কারণ যিনি উপবিষ্ট আছেন তিনি চরণদ্বীপের মৌলানা আছিয়র রহমান সাহেব। তিনি এত্তেহাদী ফয়েজের বদৌলতে দেহে পর্যন্ত হযরতের অবয়বতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খোদাতা’লার মহিমায় বয়সের ফলে চুল দাড়ি মোবারক ও একই রূপ সাদা হইয়া গিয়াছিল। যাহার ফলে আমার মত নিত্য সাহচর্য প্রাপ্ত লোকও বিভ্রান্তিতে পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমার নিশ্চিত স্মরণ আছে, তিনি দরবার শরীফ হইতে বাড়ি চলিয়া যান। জনাব বাবাজান কেবলা তখন ফটিকছড়ির বিবির হাটের নিকট সুন্দরপুর গ্রামেই ছিলেন। এমন কি হযরত কেবলার ওফাতের সময়েও বাড়ি আসেন নাই। কাজেই বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, এই রেওয়ায়েত নেহায়ত উদ্ভট ও উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে বেশি দূর যাইতে হইবে না। উক্ত জীবন চরিতের ৪৯ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে লিখা আছে, “এইরূপ হযরত (রাঃ) শেষ বয়সে তাহার বহু খাস মুরিদগণকে বাবাজান কেবলার (কঃ) খেদমতে যাইতে বলেন এবং তাহারা বাবাজান কেবলা (কঃ) হইতে ফয়েজপ্রাপ্ত হন”। এই উদ্দেশ্যটি ছাবেত করার জন্যই বোধ হয় এমন উদ্ভট রেওয়ায়েতের দরকার ছিল। সুফি তুরিকা বা দস্তুর মতে পীরে তুরিকত বা বায়েতী একজনই থাকেন। পীরে তাফাইউজ অর্থাৎ ফয়েজ বরকত বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে নেওয়ায় নিষেধ নাই। যাহারা এই পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বা অবগত আছেন তাহারা জানেন। যেমন হযরত আকদাছ, শাহসুফী হাজিউল হেরমাইন আবু শাহামা সৈয়দ মোহাম্মদ ছালেহ লাহুরী কাদেরী পীরে তুরিকত হইতে গাউছিয়তের ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া খেলাফত হাছেলে কামালিয়ত প্রাপ্ত হন এবং তিনি পীরের হুকুম মত শাহসুফী হাজিউল হেরমাইন সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (চিরকুমার) লাহুরী কাদেরী মোহাজেরে মদনী হইতে কুতবিয়তের ফয়েজ ও খেলাফত প্রাপ্ত হন। এইরূপে মৌলানা আবদুল আজিজ দেহলভী, শাহ এমদাদুল্লাহ (রাঃ) হযরত শাহ ওয়ারেছ আলী (রাঃ) প্রমুখ চিরকুমার সাহেবানেরা এবং মোল্লা ছাদী (রাঃ) এইভাবে ফয়েজ বরকত হাসেল করিয়াছেন দেখা যায়, আর রেওয়াজও আছে।

আমি নিজেও হযরত মৌলানা কুতুবে এরশাদ সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাগুরী সাহেবের নিকট বায়াতে সুন্নাত ও শিক্ষা গ্রহণ করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে বায়াত হন। তাহার ওফাতের পর আমার দাদা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী শাহসুফী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কেবলা কাবার হাতে বায়াত এবং তুরিকা কবুল করি। সেই

হিসাবে তিনি আমার পীরে তুরিকত। জনাব বাবাজান কেবলা কাবার নিকট হইতে আমি রুহানী ফয়েজ হাছেল করি এবং এলম জ্ঞান অর্জন করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে তাফাইউজ।

হযরত আকদাছ (কঃ) একদিন আমার সামনে বলিয়াছিলেন, “আমার দেলা ময়না আমার ‘বাচা’ ময়নার চেহারার উপর থাকিবে”। হযরত কেবলা জনাব বাবাজান কেবলাকে “বাচা ময়না” বলিতেন। ইহা তাহার রূপমূলক এসতেলাহী কালাম বা কথাভঙ্গি। যথাঃ আমার পিতা হযরতের একমাত্র পুত্র, শাহসুফী সৈয়দ মোং ফয়জুল হক সাহেবের ওফাত হওয়ার কয়েকদিন পর একদা খাদেমকে একখানা শাল কাপড় ও নিজের পাগড়ী মোবারক দিয়া বলিলেন, এই শাল কাপড়খানা আমার ফয়জুল হক মিয়ার কবরের উপর পরাইয়া দাও এবং এই পাগড়িটি তাহার ছিরানে রাখিয়া দাও। দস্তার বাঁধিবার জন্য তাহার আরজু, ছিল। আমি তাহাকে জনাব মৌলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রাঃ) এর চেহারার উপর রাখিয়াছি।

একদিন “দায়েরা” শরীফে তাহার বাহির বাড়ির গদি শরীফে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিলাম। হযরত কেবলা কোরান শরীফ হাতে নিয়া ১৭ “ওরক্” বা পৃষ্ঠা লিখিত অংশ বাহির করিয়া লইলেন এবং আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, “দাদা ময়না। এখানে কি হরফ আছে”? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিতে লাগিলেন, “সব হরফ উড়িয়া গিয়াছে। কমবক্তেরা কালামুল্লাহ বেচিয়া কলা মোলা খাইয়াছে, তবুও বলে কালামুল্লাহ্”। একজন খাদেমকে বলিলেন, এইগুলি আমার ফয়জুল হক মিয়ার কবরের উপর রাখো। পুনরায় ১০ ওরক বাহির করিলেন এবং আমাকে পূর্ববত দেখাইলেন এবং পূর্ববত সম্বোধন করিয়া উত্তরের সময় না দিয়া আগের মত বলিতে লাগিলেন, “সব হরফ উড়িয়া গিয়াছে। কমবক্তেরা কালামুল্লাহ বেচিয়া কলামোলা খাইয়াছে, তবুও বলে কালামুল্লাহ্”। একজন খাদেমকে হুকুম করিলেন-এইগুলি সামনের পুকুরে ঢালিয়া দাও। এইরূপ বহু “তছরুপ” মূলক আধ্যাত্মিক কাজকর্ম ও কথাবার্তা এবং “এস্তেলাহ্” কথাভঙ্গি আছে যাহার রহস্য “ছাহেবে এলমে লদুন” সোজা স্রষ্টা-জ্ঞান অর্জিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোক বুঝিতে অক্ষম। আবার এমন কতক কাজ বা কথা ভঙ্গি বা “এস্তেলাহ্” ছিল যাহা নিত্য-সাহচর্য প্রাপ্ত লোকেরাই বুঝিতে পারিত। অন্যের পক্ষে বুঝা কঠিন ছিল।

যেমন কোন বিমারী লোকের দোয়া প্রার্থীকে কলা দিলে বা সরবত খাইতে বা খাওয়াইতে বলিলে কিংবা চাদর বা রজাই গায়ে দিয়া শোয়াইতে বলিলে বুঝা যাইত সেই বিমারী ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। যদি কাহাকে বলেন, দোয়া করিতেছি বা তাহার হাদিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত দোয়া প্রার্থী সফলকাম হইবে। কাহাকে কোন ঔষধ তবরুক দিলে যথা আদ্রক, রসুন, সাজনা পাতা ও পাট পাতার ঝোল বা মধু মিছরী খাইতে বা মসল্লা ব্যবহার করার হুকুম দিলে বুঝা যাইত সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে। কাহাকে-গালি গালাজ করিলে বা হস্তস্থিত যষ্টির প্রহার করিলে সেই ব্যক্তি রোগ মুক্ত বা মামলা হইতে খালাস পাইত। এইরূপ বহু কাজ কারবার দ্বারা তছরুপে প্রভাব বিস্তার করিতে দেখিয়াছি। আবার এমন কতক কাজ কারবার ও কথাবার্তা আমার জানা আছে যাহা

সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে অথচ এইগুলিও তছরুপে মূলক রহস্য ও কথাবার্তা ছিল; যাহা সময় মত বিকাশ হইতে দেখা যায়। এই অবোধ্য তছরুপে মূলক কথাবার্তা বিরাট প্রভাবশালী সুদূর প্রসারী কালাম।

যেহেতু কামেলের বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির “হিম্মতে এরাদী” পূর্ণ ইচ্ছাশক্তিকে, কার্যকলাপ বা বাক্যালপি জনিত যোগাযোগের মাধ্যমেই সৃষ্ট জাগতিক বস্তু বা শক্তি বিশেষের প্রতি খোদায়ী শক্তির প্রভাব বিস্তার করিত যাহা এই জগতের স্বভাবসুলভ। যাহার জন্য দর্শন প্রবণ বা কাশফ অন্তর দৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা মতে অবগতি একান্ত দরকার। তৎমতে কল্যাণী মনোভাব “ফায়ালী” কার্যকরী আচরণও দরকার। যাহা না হইলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ থাকিবে না। যাহাকে “ছুলুক” বলিয়া ছুফী পরিভাষায় বলা হয়। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক আকর্ষণ বা জজবারও একান্ত আবশ্যক আছে, যাহাকে “জজব” বলে। এই কল্যাণী জজব ও ছুলুকের অধিকারী ব্যক্তিই এই তছরুপে মূলক বেলায়তের অধিকারী বা মালেক। এই তছরুপে মূলক কাজ বা বাণী লোকের লোকাচারী রীতিনীতির অনুরূপ নাও হইতে পারে। যাহা সাধারণ লোকের বুঝে আসে না।

এই কামেল হিম্মতকে পার্থিবতার সঙ্গে ফেরেস্তা বা মালায়ে ছিফলীর কার্যকরী শক্তির দিকে প্রভাব বিস্তারকে ছুফী পরিভাষা মতে তছরুপে বলে। আর মালায়ে আলা বা উর্ধ্ব জগতের ফেরেস্তা বা কার্যকরী শক্তির দিকে কামেলের হিম্মতকে উত্থিত করার নাম ছুফী পরিভাষা মতে দোয়া বা বদদোয়া যাহা সমাজের পরিচিত। এই জজব ও সুলুকের সংমিশ্রণ ছাড়া ইচ্ছা ও শক্তি একত্রিত হইতে পারে না। এই দুই এর একত্র মিশ্রণ ছাড়া তছরুপে বিকাশ হয় না। যদিও অর্জিত বা অর্পিত বেলায়ত ক্ষমতার অধিকারী বা অধিকার থাকে।

এই “লায়েক” লেখক মহোদয়ের উদ্দেশ্যে আরো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যখন ঐ জীবন চরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৪ পৃষ্ঠাতক সংক্ষিপ্ত লেখা (কঃ) এবং (রাঃ) এর হেরফেরের প্রতি নজর দেওয়া যায়। যাহাতে (কঃ) কান্দাছাছিররাহুল আজিজ এবং (রাঃ) ইঙ্গিত মতে রাজি আল্লাহ্ আনহু বুঝায়। (কঃ) অর্থ পবিত্র হউক তাহার রহস্য এবং (রাঃ) তাহার প্রতি খোদা সম্ভষ্ট হউক, অর্থবোধক দোয়া বটে। এই (কঃ) আর (রাঃ) লেখার ভিতর তিনি বুজুর্গানের মধ্যেও সম্মান ও মর্তবার বেশ কম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথাঃ- জনাব বাবাজান কেবলার নামের পর লিখিয়াছেন (ক) আর হযরত কেবলার নামের পরে লিখিয়াছেন (রাঃ) এইভাবে অন্যান্য বুজুর্গানের নামের পরও ঐভাবে (রাঃ) লিখিয়া এইসব বুজুর্গানের প্রতি এক ধরনের এবং বাবাজান কেবলার প্রতি অন্য ধরনের সম্মান বোধক সাক্ষেতিক শব্দ ব্যবহারে যেই হীন ও হেয় মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নেহায়েত হাস্যকর ও উপহাস যোগ্য।

বিজ্ঞ লেখক অবশ্য জানেন যে, হাল জজ বায় বিভোরতা বৃদ্ধি পাইলে পারিপার্শ্বিকতার প্রতি নজর দেবার অবসর লোকের থাকে না। ঘটনার অবস্থাও তদ্রূপ। কাজেই শাহ জালাল অর্থে, জালালিয়াত হাল জজবাই বুঝা উচিত ছিল। শাহজালাল ও শ্রী হট্টকে টানিয়া আনা খাপ ছাড়া দেখা যায়। সেইরূপ আরবী “এমন” শব্দের অর্থ বেপরোয়াই নিকটতম দেখা গেলেও আরবের “এমনমুলুক” ও জনাব ওয়াইছকরণীকে (রাঃ) নিয়া

টানাহেঁছড়ার চেষ্টা দেখিলে অলক্ষ্যে আসল উদ্দেশ্য উকি মারিয়া দেখা দেয়। পক্ষান্তরে হযরতের অবিকৃত কালামের প্রতি নজর দিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে “উহ শাহজালাল হ্যায়”-অর্থ সেই সময় তাহার হাল জজবা গালেব ছিল, তাই বেপরোয়া ভাবে আলমে আরওয়ায়ে ছায়ের করা, পার্থিবতা হইতে দূরে অতি উর্ধ্বের মকামে বা স্তরে বিচরণ করিতেছিলেন অর্থই বোধ হয় যথার্থ হইবে।

একই গরজে লেখক মহোদয়ের শ্বশুর সাহেব জনাব মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসেম সাহেবকে তরজুমান বা ব্যাখ্যাকারী দাঁড় করাইয়া চৌগার এক ঘটনাকে দলিল হিসাবে আনিয়াছেন। আমি সেই ঘটনার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। কারণ এই ঘটনা কাহারো মুখেও শুনি নাই। এমন কি স্বয়ং এই মোহাম্মদ হাসেম সাহেবের মুখেও কোনদিন শুনি নাই। বরং আমার দাদী আম্মার মুখে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন একদা হযরত সাহেবানী বলিয়াছিলেন, আপনি এ কি করিলেন। এমন সুন্দর ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারিয়া রক্তাক্ত করিলেন। তাহার পিতামাতা আসিলে কি উত্তর দিব। প্রতি উত্তরে হযরত কেবল বলিয়াছিলেন, “দেখ ভাই! তাহাকে আমি একটি চক্ষু দিয়াছি সে আমার দুইটি চক্ষুই চাহে। দুইটি চক্ষু তাহাকে দিলে আমি চলিব কি করিয়া।” বিষয়টি হযরত সাহেবানীর বুঝিতে দেবী হইল না। তিনি জনাব বাবাজান কেবলাকে মধুরভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনি যখন তাহাকে দেখিলেই স্থির থাকিতে বা ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন না, কয়েকদিনের জন্য বাহিরে গিয়া ছায়ের করুন। অলি উল্লাহ এবং নবী উল্লাহরা তাহাদের উপর অপিত কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই হায়াতে নাছুতির হায়াতি যুগ কাটাইতে হয়। এখনতক তাহার কাজ বাকী আছে। যাওয়ার সময় আপনার হিসসা- কিছু থাকিলে তাহা সময় মতে আপনাকে দিয়া যাইবেন। ইহা জবরদস্তিমূলক বস্তু নহে।” ইহার পর হযরত বাবাজান কেবলা ছায়েরে বাহির হইয়া যান। এই ঘটনাতেও হযরত কেবলার জবানী স্বীকার উক্তি পাওয়া যায় যে জনাব বাবাজান কেবলাকে হযরত কেবলা একটি ধারামতে ফয়েজ রহমত দান করিয়াছেন। যেই পথে যেই ব্যক্তির সফলতা নিশ্চিত, সেইভাবে হযরত কেবল বিভিন্ন ব্যক্তিকে যোগ্যতামতে গাউছিয়াত ও কুতুবিয়তের বিভিন্ন ‘মসরব’ আশ্বাদ গ্রহণ প্রণালী মতে ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ দান করিতেন। এইভাবে তাহার অসংখ্য ‘ফয়েজপ্রাপ্ত’ বা অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে দেখা যায়, কেহ ‘মজজুবে সালেক’ কেহ ‘সালেকে মজজুব’ আবার কেহ ‘মজজুবে সালেক’ প্রত্যেককেই প্রত্যেকের পথে সফলতা অর্জন করিতে দেখা যায়। যাহা সমস্ত তুরিকা বা কামেল বুজুর্গ সিদ্ধ মহাপুরুষদের স্বীকৃত পন্থা। যাহা তাহার বেলায়তে ওজমা বেলায়তে মুহিত বা বেষ্টনকারী বেলায়তের প্রমাণ।

জনাব বিজ্ঞ গ্রন্থকার সত্য প্রচারের দিক হইতে পেশাগত ভাবে দ্বিধাদিগ জ্ঞান হারা হইয়া ওকালতি এবং ব্যবসা প্রসারের দিকে যেই ভাবে ঝুকিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে তাহার “নীতি” বিভিন্ন জায়গাতে বেফাঁস প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চরম প্রকাশ হিসাবে বলিতে হয়, ঐ জীবনীর ৪১ পৃষ্ঠাতে পবিত্র “শরীফে হযরত গাউসুল আযম শাহসুফী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে গাউসুল আযম স্বীকার করেন নাই। অথচ একই গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠা

১১শ’ লাইনে লিখিয়াছেন। হযরত আকদাছ হযরত রসুল করিম (সঃ) এর কদমের উপর গাউসুল আযম ছিলেন। গ্রন্থকার সাহেবের লেখা কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস হইতে মুদ্রিত সাবেক রচনা সৈয়দ গোলাম রহমান শাহসুফী মাইজভাণ্ডারী বাবাজান কেবলা কাবার “জীবন চরিত” নামক গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় “আসমানী রং এবং রেশমী চৌগা” বলিয়া উল্লেখ আছে। অথচ হযরত কেবলা রেশমী কাপড় পরিধান করিতেন না। চট্টগ্রাম মোহছেনীয়া মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মৌলানা আবদুল মোনায়েম সাহেবকে এই রেশমী কাপড় পরার দরুণ তিনি তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে একটি আলমিরার উল্লেখও আছে, অথচ তাহার হুজরা শরীফে কোন আলমিরাই ছিল না। যদিও জীবন চরিত ২য় সংস্করণে এই অংশ এবং আরো কতিপয় অংশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে উল্লেখ করেন নাই। যেমন বর্তমান জীবন চরিতে লিখিত চৌগার ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও এই চৌগার রেওয়ায়েতটি এক সামঞ্জস্য বিহীন উক্তি। গ্রন্থকার মহোদয়ের কথা মতে হযরত কেবলা কাবার কার্যকলাপ ও কালাম খিজরী অর্থাৎ হযরত খাজা খিজির (আঃ)-এর মত রহস্যপূর্ণ এলমে লদুনীর প্রভাবযুক্ত।

গ্রন্থকারের একই উদ্দেশ্যে লিখা “আল” শব্দের বাহুল্যতার দ্বারা ধূম্রজাল সৃষ্টির সহায়তায় “লাফদিয়া” জায়গা দখলের এই প্রচেষ্টা নেহায়ত বাড়াবাড়ি মূলক এবং অনর্থক প্রচেষ্টা মনে করা যায়। এতদছাড়া উপরে উল্লেখিত চৌগার রেওয়াতের বর্ণনাকারী কথিত মওলানা হাশেম সাহেব সহোদর ভ্রাতাকে পার্থিব গরজে বাপবোলাইয়া অপরকেও বাপ বোলায়তে শিক্ষা দিয়াছেন। যাহা বর্তমানে এইস্থানে রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। যদিও পবিত্র কুরআনে প্রকাশ্যে নিষেধ করিয়া বলিতেছে, মোহাম্মদ তোমাদের কাহারো পিতা নহে। তিনি খোদার ‘রসুল খাতেমুননবী’ বা অবসানকারী (ইহাই তাহার খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব) কাজেই এই উপাধিতেই তাঁহাকে অভিহিত করা উচিত। ইহাতে প্রমাণিত হয় খোদার নবী অলিদিগকে তাহাদের খোদায়ী প্রদত্ত “মসরব” বা চলন ভঙ্গী মতেই সম্বোধন বা অভিহিত করা উচিত। পার্থিব স্বার্থ জড়িত ভাষায় নহে। কোরান সূরা আল আহজাব ৪০ আয়াত দৃষ্টব্য।

নবীয়ে কামেলের জন্য যাহা অবৈধ বা অবাস্ত্বিত, অলিয়ে কামেলের জন্যও তাহা অবৈধ। অলিয়ে কামেলের খোদায়ী প্রদত্ত ফজিলত মতে তাহার “মসরব” বা চলন ভঙ্গীর মরতবা অনুযায়ী স্মরণ করা উচিত। উক্ত সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম সাহেবকে সম্বোধন করিয়া, হযরত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক “ওয়াছেল” মাইজভাণ্ডারী সাহেব যেই সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা ফলবতী হইতে দেখা গিয়াছিল, যাহা প্রকাশ্যেও দৃশ্য ছিল। মৃত্যুর পূর্বে যাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহারা সবাই অবগত আছেন।

সত্য অনুসন্ধিৎসু, সুধীমন্ডলীর ভ্রান্তিদুর মানসে এবং কতকগুলি নেহায়ত উদ্দেশ্যমূলক ভ্রান্তনীতির ব্যাখ্যা বিচ্ছেদ করণের জন্য অনিচ্ছাকৃত ভাবে এই ক্ষুদ্র সমালোচনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

মাসিক 'জীবন বাতি' ২৯ আশ্বিন ২০১৭ সংখ্যা

[প্রিয় পাঠক, আল মাইজভাণ্ডারী ম্যাগাজিন ২২ চৈত্র ২০১৭ ও ২৯ আশ্বিন ২০১৭ সংখ্যা দু'টিতে হযরত গাউসুল আজম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কেবলা এবং অহিয়ে গাউসুল আজম শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী'র প্রতি যে ভয়াবহ অসম্মানজনক অসত্য তথ্য এবং বিকৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে রচনা প্রকাশ করেছে তা সমস্ত মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলের সবাইকে অন্তরাত্মাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এই ভয়ানক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কোন বিবেকবান সচেতন ব্যক্তি চুপ থাকতে পারেনা। এহেন অপকর্মের প্রতিক্রিয়ায় গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিল থেকে প্রকাশিত মাসিক 'জীবন বাতি'র ২৯ আশ্বিন ২০১৭ সংখ্যায় নিম্নোক্ত প্রতিবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ: (১) অনিবার্জিত আল মাইজভাণ্ডারীর জালিয়াতির চালচিত্র (২) বেলায়তে মোতলাকা ও এর লেখককে আক্রমণের কারণ ও সমাধান (৩) বাবা ভাণ্ডারীকে কেন্দ্র করে জটিলতার মূল কারণ বিশ্লেষণ (৪) দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে পুনর্বাসন (?) প্রসঙ্গ ও সমাধান (৫) "আল মাইজভাণ্ডারী" গোষ্ঠীর মাঠে ময়দানে প্রশ্নবিদ্ধের মূল কারণ এবং এর সমাধান প্রসঙ্গ। এই রচনাটি পঠনের ভেতর দিয়ে পাঠক সমাজ আল মাইজভাণ্ডারী ডেস্কের কুৎসিত চিন্তাচেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন।]

**'আল-মাইজভাণ্ডারী' - সাময়িকী ও প্রকাশিত নিবন্ধ প্রসঙ্গে
খাদেমুল হাসনাইন**

[প্রথম পর্ব : ইতিহাস চর্চায় অনবধান ও অসচেতনতার বিভ্রাট]
'গাউসুলআজম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত 'আল মাইজভাণ্ডারী' শীর্ষক একটি অনিবার্জিত ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে ঘোষিত ১১০তম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি রচনার প্রাসঙ্গিকতায় এই পর্যালোচনা। আলোকধারায় প্রকাশিত একটি লেখার সূত্রে 'উসুলে সাবয়া ও বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের স্বরূপ উন্মোচন' শিরোনামে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' এর লেখা এই নিবন্ধ 'আল-মাইজভাণ্ডারী' শীর্ষক ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়েছে। এই নিবন্ধে মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শনের মৌলিক পরিচয় এর আকরগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত 'বেলায়তে মোতলাকা' গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের লেখক, যিনি গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) [১৮২৬-১৯০৬] এর পারিবারিক উত্তরাধিকারী পৌত্র, অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী। তাঁর রচিত 'বেলায়তে মোতলাকা' এর অপমূল্যায়নে, ভ্রান্ত বিশ্লেষণে, সৌজন্য শালীনতা ও শিষ্টাচার বর্জিত অবাস্তবিক ভাষায় লেখককেও আক্রমণ করা হয়েছে। মাইজভাণ্ডার নামক এই গ্রামে স্থায়ী আস্তানায় থেকে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক সূচিত মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম শরায়ত ও দর্শনের প্রতিষ্ঠাতার প্রবর্তিত তরিকার লিখিত রূপ কাঠামো প্রত্যয়ন ও নির্ধারণে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী পারিবারিক ও অধ্যাত্ম যুগপৎ ধারায় একক অধিকারপ্রাপ্ত ও অনন্য মর্যাদায় সমাসীন ব্যক্তিত্ব। তাঁর লিখিত এই রূপ কাঠামোকে খোলফায়ে গাউসুলআজম এর দরবার সমূহ, মাইজভাণ্ডারী বিষয়ে লেখক গবেষক সহ মাইজভাণ্ডারী ভক্তবৃন্দ অকপটে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ ও বরণ করে এসেছেন। 'বেলায়তে মোতলাকা'

হওয়ার পর মাইজভাণ্ডারী দর্শনের বিশ্লেষণে 'আকরগ্রন্থ' বিবেচ্য এই প্রামাণ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'আল-মাইজভাণ্ডারী' বোধদয়ে জাগরিত চেতনায় স্বার্থান্বেষণ জর্জরিত সৃষ্ট বিভ্রান্তি সমূহ নিরসনে নৈতিক চাহিদায় এই পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নেহায়েত জরুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম দর্শনের লিখিত বিবরণে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থের ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হয়ে 'বেলায়তে মোতলাকা' নামে এই গ্রন্থটি বর্তমান সময়কালের প্রায় ৫৭ বছর পূর্বে ১৯৬০ ইংরেজি সনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। পরবর্তীতে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে গ্রন্থের প্রণেতা অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, তাঁর জীবৎকালে এই গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থ [বেলায়তে মোতলাকা] প্রসঙ্গে তৎকালীন সময়ের একাধিক প্রথিতযশা, খ্যাতিমান আলেম, অধ্যাপক, মমতাজুল মোহম্মেদীন জ্ঞানী ব্যক্তিত্বদের অভিমত যুক্ত হয়ে ১৯৭৩ইং সনে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণটিও লেখকের জীবতকালেই প্রকাশিত হয়েছিলো। তৎকালীন সময়ের ইমাম-এ-আহলে সুন্নাহ শেরে বাংলা মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী, মমতাজুল মোহম্মেদীন প্রাক্তন এম.পি.এ. জনাব মোলানা ওবাইদুল আকবর, চট্টগ্রাম কলেজের সাবেক অধ্যাপক বাবু যোগেশ চন্দ্র সিংহ ও আলেম শিক্ষক প্রথম শ্রেণী ফাজেলে আলীয়া মাওলানা নূরুল ইসলামসহ চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সপ্রশংস অভিমত পাঠকের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রবন্ধে পুনরোল্লোখ করা গেলো।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তুল ওলামার সভাপতি, তৎকালীন ইমাম-এ-আহলে সুন্নাহ ওয়াল জমাত 'শের-এ-বাংলা' অভিধায় অভিষিক্ত আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরীর অভিমত-

'আশাকরি এই কেতাবটি [বেলায়তে মোতলাকা] উচ্চ শ্রেণির তরিকতপন্থীদের জন্য উপকারে আসিবে'। আল্লাহ তা'আলা রচনাকারীকে দীন ও দুনিয়ার শান্তি ও ইজ্জত দান করুন।

মমতাজুল মোহম্মেদীন জনাব মৌলানা ওবাইদুল আকবর এম.এ. (কলিকাতা) প্রাক্তন এম.পি. এ সাহেবের অভিমত-

‘বেলায়তে মোতলাকা’ বাংলা ভাষায় সুফীবাদ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা সম্বলিত একটি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ- ইহাতে হযরত আকদাসের [গাউসুলআজম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)] আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব মহান মাইজভাগুরী তরিকার বৈশিষ্ট্য ও রূহানী বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। --- বাংলা ভাষায় সুফীবাদ সম্বন্ধে এই ধরনের গভীর আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ আর চোখে পড়ে নাই। এদিক দিয়া ইহাকে বাংলা ভাষায় এক নতুন অবদান বলা যাইতে পারে।

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ভূতপূর্ব অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বাবু যোগেশ চন্দ্র সিংহের অভিমত-

মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইনের ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থখানি এক অপূর্ণ সম্পদ।- আজ যখন মানুষের কাছে মানুষ যমমূর্তি অপেক্ষাও ভীষণতর, যখন মানুষ হিংস্রতার নগ্ন বিলাসে নিমগ্ন, যখন সে ভুলিয়াছে যে মানব প্রেমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মানবকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া নির্মল আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করাই উন্নততর সাধনা তখন এই গ্রন্থ আমাদের জীবনপথে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। -- এই গ্রন্থে রহিয়াছে নরচিত শোধনের প্রভূত অমূল্য উপাদান। মাইজভাগুরী সাধনা দ্বারা মানুষের মধ্যে ধর্ম শক্তির নব অভ্যুত্থান হউক।

মাওলানা নূরুল ইসলাম (ফাজেলে আলীয়া ১ম শ্রেণী) এর অভিমত-

এই গ্রন্থকার [বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের লেখক খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী] বাংলা সাহিত্যে এই সব তত্ত্ব সম্পন্ন একখানা গ্রন্থ রচনার ফলে বাংলা সাহিত্যকে সুফী সভ্যতার আলোক প্রদানকারী এক অভিনব পন্থার সন্ধান দিতে সমর্থ দেখা যায়, যাহা নেহায়েত দার্শনিক সত্য।

বলাই বাহুল্য উল্লেখিত ব্যক্তি চতুস্তয়ের উদ্ধৃত অভিমতের আলোকে ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থের প্রকরণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে নবীন পাঠকবৃন্দ একটি প্রাথমিক ধারণা পেতে সমর্থ হবেন।

‘মাইজভাগুর’ উপমহাদেশে অধ্যাত্মচর্চার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মাইজভাগুরী দর্শনের অনুশীলনীয় কর্মপন্থার বিশ্বমাত্রিক গ্রহণযোগ্যতা এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের আত্মিক উন্নয়নে এই দর্শন যথেষ্ট কার্যকর। চারিত্রিক ও ব্যক্তি মানসে উন্নততর অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র এবং বিশ্ব ব্যবস্থায় কল্যাণ হাসিলের অব্যবহিত অবকাশ ইতোমধ্যে বিশ্বের সুফীবাদী লেখক, গবেষক, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমীহ জাগানিয়া আগ্রহ তৈরিতেও মাইজভাগুরী দর্শন সমর্থ রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও ‘মাইজভাগুরী’ এই পরিচিতি ব্যবহারপূর্বক কিছুসংখ্যক মানুষ মাইজভাগুরী তরিকা ও দর্শন সম্পর্কে অযাচিত বিভ্রান্তি বিভ্রাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে একধরনের অব্যবহিত ও নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে এসেছে। বস্তুত অধ্যাত্মকেন্দ্র হিসাবে মাইজভাগুরকে কেন্দ্র করে এই বিপ্রতীপ ও পরস্পর বিরোধী বিভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা অপনোদনের লক্ষ্যেই গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর উত্তরাধিকারী পৌত্র অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী ‘বেলায়তে মোতলাকা’ শীর্ষক গ্রন্থটি রচনাপূর্বক প্রকাশের অনিবার্য আবশ্যিকতা অনুধাবন করেছিলেন। এই গ্রন্থ

রচনার প্রেক্ষাপট, লেখক হিসাবে স্বীয় অধিকার এবং অনন্য যোগ্যতাসহ তাঁর অবিসম্বাদিত অবস্থান ও কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের দুটি কথায় এতদবিষয়ে তিনি সবিশেষ উল্লেখ করেছেন।

এই ‘মাইজভাগুরী বেলায়তের’ খুছুছিয়াত বা বিশেষত্ব কি? বিশ্বমানবতার জন্য ইহার কি অবদান আছে? ইহা গতানুগতিক সুফী মতবাদ, না নতুন কিছু? এই বেলায়তের যিনি মূলধার তাহার অনুসারীদের মূলনীতি কি? ইত্যাদি প্রশ্ন মনে জাগার ফলে হযরতের ৫২তম ওরশ শরীফ ১০ মাঘ শুক্রবার সন ১৩৬৪ বাংলা মোতাবেক ১৯৫৮ইং ২৪ জানুয়ারি; ইউরোপ ভূখণ্ডের অধিবাসী চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট Mr. Macanangi সি.এস.পি. তিনজন সম্মানিত অতিথিসহ প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে তত্ত্ব জানিবার জন্য মাইজভাগুর দরবার শরীফে আগমন করেন।---

এহেন মুহূর্তে অনুসন্ধিৎসু লোকদের প্রশ্নাদির উত্তর দেওয়ার মত তাহার বেলায়তের সোহবত ও সাহচর্য্য প্রাপ্ত বুজুর্গানে দ্বীনেরা যাহারা নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তাহারা অনেকেই এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পরবর্তীদের মধ্যে যাহারা আছেন তাহাদের অনেকেই খেদমত ও সোহবত হইতে বঞ্চিত বিধায় তাহার বেলায়ত সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ মনগড়া কাজকর্ম করেন ও কথাবার্তা বলিয়া থাকেন।---

পরবর্তীদের পরবর্তী বলিয়া দাবীদার কোন কোন লোকের অজ্ঞতাজনিত কথাবার্তা ও কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে কোন কারণে হোক না কেন এই বেলায়তের এক বিকৃতরূপ জাহির করিতে তাহারা কর্মতৎপর। ইহার ফলে সত্যানুসন্ধিৎসু লোকেরা বিভ্রান্তি ও ধাঁধায় পতিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া কিছু সংখ্যক ভবঘুরে লোক এই রকমও আছে, যাহারা নিজ অভ্যস্ত পানদোষ, অকর্মণ্যতা ও কর্মবিমুখতা প্রভৃতি দোষ ঢাকিবার গরজে নিজেকে ‘মাইজভাগুরী’ বা ‘আজমীরি’ বলিয়া জাহির ও দাবী করিয়া থাকে।-

তাহাদের এহেন ভুল ধারণা ও অপপ্রচার এবং অযথা বিরোধ ফ্যাসাদ দিনদিন দানা বাঁধিতে থাকিবে মনে করিয়া এবং মিশনারী আগন্তুক তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষী ব্যক্তিদের প্রশ্নের সমাধান, তরিকতপন্থী ও বেলায়ত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু সুধীবর্গের জ্ঞাতার্থে আমি হুজুরে আকদাছ হযরত শাহসুফি মৌলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) ছাহেবের অনুগ্রহ ও খেদমত সোহবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী বংশধর তাহার একমাত্র পুত্র সন্তান মৌলানা সৈয়দ ফয়জুল হক মরহুম শাহ সাহেবের একমাত্র বিদ্যমান পুত্র এবং হযরত আকদাছের সাজ্জাদানশীন বিধায় নৈতিক দিক দিয়া এই বেলায়তের স্বরূপ উদ্ঘাটন রূপ দুঃসাহসী কাজে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলাম। [গ্রন্থকারের দুটি কথা : বেলায়তে মোতলাকা]

এই মহান অধ্যাত্ম মিলন কেন্দ্রের সূচনা সময় থেকে শতবছরের বিবর্তন ধারায় মাইজভাগুর দরবার শরীফ এর প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটের মূল্যায়নে অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী স্বীয় স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে ‘এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক’ শীর্ষক আত্মকথন [Autobiography] মূলক একটি পুস্তিকা রচনাপূর্বক তাঁর জীবৎকালে প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যাত্মকেন্দ্র হিসাবে মাইজভাগুর থেকে মাইজভাগুর দরবার শরীফ পরিচয়ের বিবর্তন ধারার প্রামাণ্য পরিচয় উন্মোচনে এই অধ্যাত্ম কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডে

প্রত্যক্ষদর্শীর ‘জবানবন্দী’ হিসাবে মাইজভাণ্ডারী লেখক ও গবেষকদের নিকট এই গ্রন্থটিও স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে অবলীলায়। বেলায়তে মোতলাকা রচনাপূর্বক প্রকাশের এক যুগ পর প্রকাশিত উল্লিখিত এই গ্রন্থ রচনার কারণ হিসাবে উপস্থাপিত তাঁর সেই বক্তব্যটিও এতদ প্রাসঙ্গিকতায় প্রণিধানযোগ্য।

বর্তমানে এবং কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন ব্যক্তি বারংবার আমাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহেন; এখানে দুইটি ছিলছিল এবং আচারে বিচারে, কর্মক্ষেত্রে সভ্যতার রূপরেখা দেখা যায়, তাহার কারণ কি? ইহার উৎপত্তি এবং পরিণতি কোথায়?

এই মহান অধ্যাত্ম কেন্দ্রের সূচনাকারী, মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা, মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক মাইজভাণ্ডারী দর্শনের উদ্গাতা মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) এবং দ্বিতীয় বুজুর্গ হিসাবে এই অধ্যাত্ম কেন্দ্রের প্রবহমান ধারায় অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.) উভয়ের কামালিয়তের প্রকৃতিও তিনি এই পুস্তিকায় উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম বুজুর্গ : হযরত গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া ‘ছিলছিলার’ মালামিয়া মশরব সম্পন্ন বিশ্বঅলী উল্লাহ ত্রাণ কর্তৃত্বে হাদীয়ে কামেল ছিলেন। বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁহার ‘জীবনী ও কেরামত’ গ্রন্থ তাঁহার বেলায়ত পরিচিতি সম্বলিত ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থ এবং উর্দু ভাষায় ‘আয়নায়ে বারী’ প্রভৃতি ছাপান গ্রন্থাদি তাঁহার বেলায়তের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ। আচার-রীতিনীতি ইত্যাদি উক্ত ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থে খোলাখোলি উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় বুজুর্গ : কুতবীয়ত ধারামতে মিশ্রিত মাদার মশরব সম্পন্ন কুতুবুল আকতাব, মগলুবুল হাল বিভোর চিন্তা, কথা পরিত্যক্ত ভাষাভূলা কামেল অলিউল্লাহ, ছলুক পরিত্যক্ত জজবাতি হাল বা অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। যাহার ফলে পার্থিব অনুভূতি প্রাধান্য নাহুত মকামের আন্নারা স্তরের জনগণের জন্য এহেন জজবাতি ভাবধারা প্রাধান্য অলিউল্লাহর ফয়জ বরকত হাল-চাল, রীতিনীতি ও জ্ঞানজ্যোতি বুঝার জন্য একজন দিল নিবন্ধ কুতবে ইরশাদের মধ্যস্থতা অনিবার্য। তাই মাওলানা রুমী (র.) বলেন- যে কোন কাঁচা বস্তু বা খাদ্যপাক বা তৈয়ার করিতে হইলে ‘ডেকচি’ পাত্র বা তাবার মধ্যস্থতা অনিবার্য। কিন্তু পাকা ধাতু লোহা প্রভৃতিকে জ্বলন্ত আগুনে দিলে ধ্বংস হয় না বরং খাঁটি হইয়া প্রফুল্লতা ও আগুনের রঙ গুণ লাভ করে। এহেন খোদার জাতে ‘মোস্তাগরক’ বিভোরচিন্তা ফানীফিল্লাহ খোদারজাতে বিলিন, নূরে প্রজ্বলিত অলিউল্লাহর যিনি মোতারজ্জম বা ভাষ্যকার সাজিয়াছিলেন দুর্ভাগ্যবশত: তিনি ছিলেন একজন চতুর সংসার লোভী কুটবুদ্ধি পরায়ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কাজেই তাঁহার রীতিনীতি খোদা পথচারীর জন্য ‘আবে হায়াত’ প্রাণশক্তি দানকারীর পরিবর্তে বিপরিতরূপে খোদা পথচারীর প্রাণঘাতি রূপেই দেখা দিয়াছিল।

বিগত কয়েক সংখ্যা ধরে ‘আল-মাইজভাণ্ডারী’ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে প্রকাশিত কতিপয় লেখায় অছি-এ-গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর উক্ত পর্যবেক্ষণের অকাট্য বাস্তবতায় মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শনের মূলধারার বিরুদ্ধাচারে এবং এই অধ্যাত্মধারা সম্পর্কে বিভ্রান্তিপূর্ণ লেখালেখিতে দরবারে আগত কতিপয় খোদা পথচারীর জন্য সত্যের তথ্য ‘আবেহায়াত’ সন্ধানের পরিবর্তে ‘প্রাণঘাতি’ রূপের সেই প্রদর্শনীই লক্ষ্যণীয় হয়ে রয়েছে। বিগত ২২ চৈত্র, ৫ এপ্রিল ২০১৭ইং তারিখে প্রকাশিত ‘আল-

মাইজভাণ্ডারী’ এই মহান দরবারের অনেকগুলো প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অস্বীকার করে নিজেদের মতধারাকে ‘মাইজভাণ্ডারী’ যুক্ত করে উপস্থাপনপূর্বক তাদের পরিকল্পিত অভিন্ন প্রয়াস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বলাইবাহুল্য নিজেদের অবস্থান, অধিকার এবং সিদ্ধতা বিষয়ে কর্পূরীয় ভাবনাই তাদেরকে এই ধরনের ভ্রান্তিবিলাসে নিমগ্ন থাকার অবকাশ তৈরি করে দিয়েছে। ১৮৬১ইং সন থেকে মাইজভাণ্ডার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আস্তানা-এ-পাক থেকে সূচিত হয়ে ১৯০৬ইং পর্যন্ত গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর জাহেরা উপস্থিতিতে নির্দেশিত পথে ও মতের আলোকেই মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম শরাফত, তরিকা ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই শিক্ষার দীপ্ত আলোয় উদ্ভাসিত খলিফায়ে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শন বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। এই সত্যের বাস্তবতাকে আড়াল করে মূলত আল-মাইজভাণ্ডারী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তাদের সৃষ্ট অযাচিত বক্তব্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির বিষয়গুলো প্রসঙ্গ সমূহ চার পর্বের এই আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর দিগনির্দেশনার অনুসরণে ‘ফ্যাসাদ’ পরিহার করে সত্য প্রকাশে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখে মূলধারার আওলাদবন্দ কার্যক্রম সমূহ পরিচালনা করায় ‘আলমাইজভাণ্ডারী’ কর্তৃপক্ষ শিষ্টাচার, লৌকিকতা, শালিনতাসহ সকল বিশেষণকে নির্বাসন প্রদানপূর্বক বিগত ২২ চৈত্র ৫ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায় যে লেখা প্রকাশ করেছেন তার প্রাসঙ্গিকতায় মূলত সকলের বিভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যেই এই পর্যালোচনা উপস্থাপিত হচ্ছে। বাতেল ফেরকার লেখকবৃন্দ একটি নির্দিষ্ট এজেন্ডার ভিত্তিতে তাদের লেখালেখি প্রকাশ করে থাকে। জানার ক্ষেত্রে অগ্রহের অভাবে এই অধ্যাত্ম ধারার আলোকে হেদায়ত তাদের সৌভাগ্যে হয়তো নসীব হবে না। কিন্তু যারা সত্যতা গুন্য, বানোয়াট তত্ত্ব ও তথ্যের সূত্রে আবাস্তিত ভাবে বিভ্রান্তির এই গহ্বরে পতিত হয়ে বাতেলপন্থীদের যুক্তিকে নিজেদের ত্রাণ উৎস ভাবেন তাদের ভ্রান্তি অপনোদনে যদি এই উদ্যোগ কোন ধরনের সহায়তা করতে পারে সেই প্রাণ্তিই হবে সকলের জন্য পরম সৌভাগ্যের। এই সূত্রে পর্যায়ক্রমে মাইজভাণ্ডারী তরিকা, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বলিত শরাফত এর মৌলিক ইতিহাস ও তাদের অবোধ্য বিষয় সমূহের পর্যালোচনাকে আমরা পাঠকদের বিবেচনায় মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ।

আল-মাইজভাণ্ডারীর জাল তথ্য

‘আল-মাইজভাণ্ডারী’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কথিত লেখা বিষয়ে পর্যালোচনার পূর্বে এই প্রকাশনার ইতিহাস ও এই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কতিপয় ‘জাল’ বা মিথ্যা তথ্যাবলী বিষয়ে সৃষ্ট বিতর্ক ও ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ বিষয়ে সচেতন পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা জরুরী। অসত্য ও প্রবঞ্চনার ওপর দাঁড়িয়ে ‘আল-মাইজভাণ্ডারী’ কর্তৃপক্ষের উক্ত প্রবন্ধে কথিত ‘সত্যকে পুনঃউদ্ধারের’ উদ্দেশ্যপূর্ণ এই চেষ্টার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন পাঠকদের পক্ষে অবহিতি যেমন সহজ হবে তেমনি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মহান অধ্যাত্ম মিলনকেন্দ্র হিসাবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের শরাফতের সুরক্ষায় অছি-এ-গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী সুদীর্ঘ সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সমূহ প্রসঙ্গে অনেক অনধিত ও অজানা ইতিহাস সম্পর্কেও পাঠকবৃন্দ অবহিত হওয়ার অবকাশ লাভে সমর্থ হবেন।

সত্যতা শূন্য তথ্য

(১) ২২ চৈত্র, ৫ এপ্রিল ২০১৭ইং সংখ্যাটি প্রকাশের পরিসংখ্যানে ১১০তম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা' পরিচয়ে 'আল মাইজভাণ্ডারী' নামের এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হয়েছে।

(২) এই ম্যাগাজিনের প্রিন্টার্স লাইনে 'গাউসুলআজম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদ' কর্তৃক গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বলা হয়েছে।

(৩) তাদের ভাষ্য অনুযায়ী ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথমে প্রকাশের দাবীকৃত এই প্রকাশনার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বাবা ভাণ্ডারী কেবলার ৪জন শাহজাদার নাম প্রিন্টার্স লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে বাবা ভাণ্ডারী কেবলার বংশধারায় ৮জন এবং গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর দ্বিতীয় ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল হামিদ (রহ.) এর পুত্র সৈয়দ নুরুল হক (র.) এর বংশধারায় ২জনসহ সর্বমোট ১০জনের একটি উপদেষ্টা প্যানেলের পরামর্শে নির্বাহী সম্পাদক, সম্পাদক ও তিনজন সহ-সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে এই সংখ্যার ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত তিনটি তথ্য বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

১নং তথ্য প্রসঙ্গে প্রকাশকের সরবরাহকৃত এই তথ্যের সূত্রে 'আল মাইজভাণ্ডারী' নামীয় এই সাময়িকীর প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ স্বীকারপূর্বক সচেতনভাবে ঘোষণা করেছেন যে আজকের সময় থেকে ১১০ বছর পূর্বে ১৯০৭ইং সনে 'আল মাইজভাণ্ডারী' নামীয় এই ম্যাগাজিন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ আলোচ্য এই সংখ্যায় ১৭নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে 'মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল হতে 'খোশরোজ সওগাত' শিরোনামে একটি মুখপত্র প্রকাশিত ছিল। যার পূর্বে মাইজভাণ্ডার শরীফে আর কোন মুখপত্র ছিল না'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯২৮ইং সনে প্রতিষ্ঠিত রহমান মঞ্জিলে বাবা ভাণ্ডারী কেবলাকে স্থানান্তরিত বা 'হিজরত' করার পরবর্তীতে সূচিত খোশরোজ আয়োজন উপলক্ষে 'খোশরোজ সওগাত' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল [সূত্র : খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কৃত এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক : পৃষ্ঠা ১৩]। আল-মাইজভাণ্ডারী একই সংখ্যায় প্রকাশিত উভয় তথ্যের আলোকে

জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ১. ক. : কথিত 'শতবর্ষী' দাবীকৃত 'আল-মাইজভাণ্ডারী' না ১৯২৮ইং পরবর্তীতে প্রকাশিত 'খোশরোজ সওগাত' প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় এই দরবার থেকে প্রকাশিত প্রথম সাময়িকী হিসাবে গণ্য হবে? এই বিষয়ে প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ কোন সত্যকে গ্রহণ করবেন? যেহেতু পরস্পর বিরোধী উভয় দাবীর উত্থাপকই হলেন 'গাউসুলআজম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদের' কর্মকর্তাবৃন্দ। ফলে এই ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ধারণের সার্বিক দায় [ম্যাগাজিনের কভারে ১১০তম বর্ষ এবং প্রথম প্রকাশনা হিসাবে খোশরোজ সওগাতের প্রকাশ] সম্পূর্ণভাবে তাদেরকেই বহন করতে হবে। যেহেতু অসত্য ও মিথ্যা মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ। ফলে গাউসুলআজম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদের নামে 'আল-মাইজভাণ্ডারী' নামীয় কথিত এই ঐতিহাসিক (?) ম্যাগাজিনের বিষয়ে 'আল-মাইজভাণ্ডারী' ম্যাগাজিনের দাবী অনুযায়ী তাদের এই প্রকাশনাটি ১৯০৭ইং সনে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বলেই প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৭ইং সনে প্রকাশিত সংখ্যার কভারে ১১০ বর্ষ উল্লেখ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন : ১. খ. : 'আল-মাইজভাণ্ডারী' কর্তৃপক্ষের দাবী

অনুযায়ী ১৯০৭ইং সনে ১ম সংখ্যা ম্যাগাজিনটি কোন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল?

জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন : ১. গ. : ১৯০৭ সালে প্রকাশের দাবীকৃত কথিত 'আল-মাইজভাণ্ডারী' এর সম্পাদক ও প্রকাশক কে ছিলেন? কোন কোন লেখকের লেখা ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল?

২নং তথ্য প্রসঙ্গে : প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ প্রিন্টার্স লাইনে 'আল-মাইজভাণ্ডারী' প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হয়েছে গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল মাইজভাণ্ডার শরীফ ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ২য় কভারে 'মাইজভাণ্ডার শরীফ হতে' একটি এলানও প্রকাশ করা হয়েছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'গাউসুলআজম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদ' রহমান মঞ্জিল থেকে বাবা ভাণ্ডারী কেবলার আদর্শ, অনুষ্ঠানাদির নিয়ন্ত্রক পুত্রবংশীয় আওলাদদের উদ্যোগেই গঠিত হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রায় ৯০ বছর পূর্বে মাইজভাণ্ডার গ্রামে নয় বরং মাইজভাণ্ডার মৌজায় পার্শ্ববর্তী মৌজার আজিমনগর গ্রামের সীমানা এলাকায় ১৯২৮ইং সনে 'রহমান মঞ্জিল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎপূর্বে মাইজভাণ্ডার গ্রামে রহমান মঞ্জিল নামে কোন ধরনের স্থাপনা কোন কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ২.ক. : ১৯০৭ সালে কোন মঞ্জিল থেকে এবং কোন মাসে এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হয়েছিল?

জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ২.খ. : ১৯২৮ইং সনে প্রতিষ্ঠিত 'রহমান মঞ্জিল' আজো অভিন্ন অবস্থানে রোসাংগিরী ইউনিয়নের আজিমনগর নামীয় গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ফলে রহমান মঞ্জিল মাইজভাণ্ডার শরীফ ঠিকানা সম্বলিত এই প্রকাশনার ঘোষণা কতটা সত্যতা ও বাস্তব প্রসূত তথ্যের ধারক?

জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন ২.গ. : মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা, তরিকার প্রবর্তক গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) এর পুত্রবংশীয় সকল আওলাদ, দরবারে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর জিম্মাদার, মোস্তাজেম, সাজ্জাদানশীন হিসাবে দরবারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন তাঁদের সম্পৃক্ততা ও অনুমোদন ব্যতিরেকে আওলাদে খলিফা-এ-গাউসুলআজম হিসাবে 'গাউসুলআজম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদ' এর নামে কোন অধিকার ও যোগ্যতায় 'মাইজভাণ্ডার শরীফ' থেকে কথিত এই এলান প্রদান করা হয়েছে?

৩নং তথ্য প্রসঙ্গে : 'আল-মাইজভাণ্ডারী' নামীয় এই প্রকাশনায় বাবা ভাণ্ডারী কেবলার ৪জন পুত্র সন্তানের সবাইকে এই প্রকাশনার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বলাইবাছল্য উল্লিখিত এই চারজন আওলাদের মধ্যে একাধিক আওলাদ ১৯০৭ইং সনের পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক এই সত্য সম্পর্কে প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের এই ক্ষেত্রে অবলম্বিত শঠতার ন্যায় এই দরবারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যও কি এই কৃষ্ণহস্তধারী ও স্বার্থে প্রলুদ্ধ ব্যক্তিদের হাতে নিগৃহীত হতে থাকবে?

জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন : ৩.ক. : ১৯০৭ইং সনে আল-মাইজভাণ্ডারী ম্যাগাজিনের কথিত প্রকাশনার সময়ে বাবা ভাণ্ডারীর পুত্র বংশীয় একজন আওলাদ ছাড়া বাকী আওলাদের জন্ম হয়নি বলে প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়। ফলে বাবা ভাণ্ডারীর সকল সাহেবজাদাদেরকে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গাউসুলআজম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদের তত্ত্বাবধানে 'আল-মাইজভাণ্ডারী' নামে প্রকাশিত ম্যাগাজিনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো কিভাবে? এটা কি বর্তমান পরিচালনা কর্তৃপক্ষের চৌর্যবৃত্তি নয়?

চলমান সময়ে আল-মাইজভাগুরী নামের এই সাময়িকীটি প্রকাশের দায়িত্বে যেহেতু ‘গাউসুলআজম বাবা ভাগুরী পরিষদ’-এর নাম ব্যবহৃত হয়েছে সেহেতু প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে ঘোষিত ১৯০৭ইং সালে প্রকাশিত ‘আল-মাইজভাগুরী’ ম্যাগাজিন বিষয়ে উল্লিখিত সকল জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের প্রামাণ্য তথ্য সরবরাহের সার্বিক দায় ও দায়িত্ব উক্ত পরিষদের কর্মকর্তা তথা উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদক মণ্ডলীর ক্ষেত্রেই আপতিত রয়েছে। এতদবিষয়ে প্রমাণ সহকারে তথ্যাবলী সাধারণ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উক্ত প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে উন্মোচন করবেন আশা করি।

এতদপ্রসঙ্গে সকলের জানা জরুরী যে মাইজভাগুরী শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা গাউসুলআজম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) [১৮২৬-১৯০৬] এর স্মৃতিস্মারক অনুষ্ঠান হিসাবে ১৯০৭ইং সন থেকে ১০ মাঘ বার্ষিক ওরশ শরীফ ছাড়া তাঁর জন্মদিবস বা ‘খোশরোজ’ শিরোনামে কোন ধরনের অনুষ্ঠান দরবারে পাকে এই দরবার প্রতিষ্ঠার সূচনা সময় থেকে অদ্যাবধি আনুষ্ঠানিকতায় পালিত হয়নি।

গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর উত্তরাধিকারী পৌত্র ‘খাদেমুল ফোকরা’ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন কর্তৃক রচিত ‘এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক’ শীর্ষক গ্রন্থের ১৩নং পৃষ্ঠায় (প্রথম সংস্করণ) এই দরবারে বাবা ভাগুরী কেবলার খোশরোজ পালনের তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও আল-মাইজভাগুরী ম্যাগাজিনে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত আলোচ্য লেখাসহ এতদ প্রাসঙ্গিকতায় তাদের অপরাপর লেখা সমূহের মূল্যায়নে উদ্যোক্তাদের অন্তর্নিহিত ‘উদ্দেশ্য’ এবং ‘বিধেয়’ এর সাযুজ্য এবং লক্ষ্যের অভিন্নতা এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। কুমিল্লা জেলার মতলব থানা নিবাসী আবদুল লতিফ পাটোয়ারীর সৌজন্যে খরিদকৃত জমিতে ঘর তৈরি করে ১৯২৮ইং সনে বাবা ভাগুরীর ৪ শাহজাদা মাইজভাগুর মৌজায় পৈতৃক ভিটা থেকে পার্শ্ববর্তী আজিমনগর মৌজায় নতুন আবাস ‘রহমান মঞ্জিলে’ বসবাস শুরু করেছিলেন। এই সময়ে চালচিত্র সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীর বর্ণনায়-

পক্ষান্তরে আজিমনগর মৌজা স্থিত বর্তমান রহমান মঞ্জিলের জায়গাটি কুমিল্লা জিলার মতলব থানা নিবাসী আবদুল লতিফ পাটোয়ারী খরিদ করিয়া দিলে রহমান মঞ্জিল ঘরখানা তৈয়ার করার পর বাবা কেবলাকে নিয়া তাহারাসহ উক্ত বাড়ীতে চলিয়া যান এবং এই বাড়ীতে আসা বন্ধ করেন। বাবা কেবলা এই বাড়ীর দিকে আসিতে চেষ্টা করিলেও দীর্ঘাকৃতি সবল কায়িক শফর আলী ‘হেফাজতকারী’ রক্ষী ধরিয়া কোলে করিয়া পালঙ্কের উপর বসাইয়া দিতেন। তাহার এই বাড়ীর অবস্থান ঘরটি ভাঙ্গিয়া সরঞ্জামগুলি তথায় আজিমনগর বাড়ীতে নিয়া যায়। এই সুবর্ণ সুযোগে সৈয়দ খায়রুল বশর ছাহেব ‘মোছাহেব’দিগকে নিয়া শহরে, হোটেল বায়োস্কোপে, গাড়ীতে, চা সিগারেটে বেশ অভ্যস্ত ছিলেন। গ্রামের বাড়ী ‘রহমান মঞ্জিল’ শহরে জায়গা খরিদ, পাকা দালান তৈরী, ভাতাগণের খরচ এবং আমার বিরুদ্ধে তদবীর-তাগাদা ইত্যাদি খরচের চাপে দেনাগ্রস্ত হইতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে এই মোছাহেবদের পরামর্শে চাচাদের উৎসাহে হযরত কেবলার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির সুনামের প্রতিদ্বন্দ্বি হিসাবে ‘রহমান মঞ্জিল’ বাবা শব্দের পর ‘বাবাভাগুরী’ ‘গাউসুলআজম’ উপাধি নাম জারি করেন এবং হযরত কেবলা হইতে তাহার ‘মরতবা’ দরজা বড় ইত্যাদি প্রচার আরম্ভ হইল। যুক্তি হিসাবে

বলিত, প্রাইমারী শিক্ষক হইতে কলেজের শিক্ষকের যোগ্যতা কি বড় নহে?

খোশরোজ শরীফ : এই বুদ্ধিমান শিক্ষিত মোছাহেবদের পরামর্শে নিয়মিত পূজার বন্ধের তারিখে বাবা কেবলার জন্মদিন প্রচারে ‘খোশরোজ’ অনুষ্ঠান ঘোষণা করেন। খোশরোজ ‘সাওগাত’ নামে প্রচারমূলক ‘ম্যাগাজিন’ এবং ‘মানব মঙ্গল’ তহবিলের প্রচার করেন।

খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীর লিখিত বিবরণের সূত্রে জানা যায় যে বাবাভাগুরীর খোশরোজ আয়োজন এবং খোশরোজ সাওগাত নামীয় ম্যাগাজিন প্রকাশ ১৯২৮ইং পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র, ফয়েজ ও নেয়ামতপ্রাপ্ত খলিফা মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলাম রহমান প্রকাশ ‘বাবাভাগুরী’ [১৮৬৫-১৯৩৭ইং] ১৯০৬ইং সন থেকে ১৯২৭ইং সন পর্যন্ত নিজ জন্মস্থান ‘মাইজভাগুর’ গ্রামে অবস্থিত পৈতৃক আবাসে অবস্থানকালীন সময়েও কোন ধরনের ‘খোশরোজ’ অনুষ্ঠান পালিত হয়নি। এই সময়ের বৃত্তে [১৮৬১-১৯২৮] মাইজভাগুরী অধ্যাত্মধারার প্রাসঙ্গিকতায় একাধিক গ্রন্থ, পুস্তিকা, মাইজভাগুরী গীতি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হলেও দরবার এর ব্যবস্থাপনায় কোনধরনের মুখপত্র বা ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিলো এরকম কোন প্রামাণ্য তথ্য এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ফলে ১৯০৭ সালে ‘আল-মাইজভাগুরী’ শীর্ষক ম্যাগাজিন প্রকাশের ‘অবাস্তর’ ও ‘উদ্ভট’ দাবী বিষয়ে ‘গাউসুলআজম বাবা ভাগুরী পরিষদের’ পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত, সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য তথ্য উপস্থাপনে অপারগ হলে প্রকাশ্য ঘোষণায় ভ্রান্তি স্বীকারের আহ্বান জানাই।

বস্তুত গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল প্রতিষ্ঠা সময় (১৯২৮ইং) থেকেই ফটিকছড়ি থানা এলাকায় আজিমনগর মৌজায় [মাইজভাগুর মৌজার পার্শ্ববর্তী ও সংলগ্ন] মৌজায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতদপ্রসঙ্গে বাবা ভাগুরীর পৌত্র শাহজাদা মাওলানা বদরুদ্দোজা কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বিবরণ রয়েছে-

নিজ পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিয়া ১৯২৮ খৃস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী তারিখে নবনির্মিত ‘গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল’ নামক দালানে হিজরত করিয়া আসেন। এই স্থান আজিমনগর মৌজার অন্তর্গত। তদীয় হিজরত স্থান আজিমনগর ও জন্মস্থান মাইজভাগুরের মধ্যে তেমন দূরত্ব নাই। আর এস. জরীপ অনুসারে তাহার রওজা শরীফের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পাকা নর্দমার দক্ষিণ সীমায় মাইজভাগুর মৌজা এবং সেই নর্দমা হইতে উত্তর দিকে আজিমনগর মৌজার সীমা নির্ধারিত আছে।

‘মাইজভাগুর’ নামের সাথে ‘শরীফ’ যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত বর্তমানে মাইজভাগুর শরীফ মৌজায় ১৯২৮ইং পূর্ববর্তী সময়ের কোনকালে গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল কোন স্থাপনা অবস্থিত ছিল না। বর্তমানেও ১৯২৮ইং সনে প্রতিষ্ঠিত রহমান মঞ্জিল অভিন্ন অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সুতরাং ‘আল-মাইজভাগুরী’ প্রিন্টার্স লাইনে প্রাপ্তিস্থান বর্ণনাটি সত্য তথ্যের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তা পাঠকবৃন্দ মূল্যায়ন করলে ‘ক্যাপসুল’ পরিধানের মাধ্যমে সত্যকে আড়াল করার প্রয়াসে কপটচারণ ও নৈতিকতায় অসংলগ্নতার বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে।

গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর অধ্যাত্ম শরাফত ও পারিবারিক, এই যুগল উত্তরাধিকারীত্বের অধিকারে দরবারে গাউসুলআজম

মাইজভাগুরী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে একক কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী তাঁর রচিত বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থ এবং মাইজভাগুরী দর্শনের স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম পরিচায়ক অনুশীলনীয় কর্মপন্থা ‘উসুল-এ-সাবআ’ এর প্রসঙ্গে তাদের অসহিষ্ণু ও ক্ষুদ্র মনোভাবের যৌক্তিক জবাব পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করে সত্যের বাস্তবতা পাঠকদের জন্য উন্মোচিত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

‘আল-মাইজভাগুরী’ প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের দাবী অনুযায়ী ১৯০৭ইং সনে কথিত প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বাবা ভাগুরীর অনাগত সন্তানদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সত্যতাবর্তিত ইতিহাস রচনার ন্যায় তাদের সকল উদ্ভট পর্যালোচনার অনুরূপ পরিণতিতে কপটতার আলখেল্লা খুলে পর্যায়ক্রমে সত্যের প্রকাশকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভাসিত হতে দেখা যাবে।

গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর পুত্রের বংশের একক উত্তরাধিকারী সাব্যস্তে অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী কর্তৃক রচিত ‘আত্মকথন’ মূলক রচনা ‘এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক’ এবং তাঁর ওফাত পরবর্তী সময়ে তাঁর বুক শেলভ থেকে প্রাপ্ত নিজ হস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের কতিপয় অংশের উদ্ধৃতি কথিত ‘পুনর্বাসনকারীদের’ ‘বগলমে ইট মুখে শেখ ফরিদ’ জাতীয় ভূমিকার বাস্তব চিত্রকে পাঠকদের নিকট উন্মোচিত করবে।

হযরতের ওফাত ও পারিবারিক এন্তেজাম :

একই সালের ১০ মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলক্বদ ২৩ জানুয়ারী সোমবার দিবাগত রাত ১টার সময় হযরত কেবলা ওফাতপ্রাপ্ত হন। ইহার তেতাল্লিশ দিন পর আমার বড় ভ্রাতা সৈয়দ মীর হাসান সাহেব মারা যান। পরে আমার ছোট ভগ্নি সৈয়দা ছফুরা খাতুনও এভাবে মারা যান। পরিবারে শাসন সরবরাহ যোগ্য কেহ না থাকা অবস্থায় দাদী আম্মা ছাহেবা, সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম সাহেবকে আমোক্তার নিযুক্তক্রমে যাবতীয় কাজের ভার তাহার উপর অর্পণ করেন [এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক]

অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী রচিত একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ ‘জীবনদর্শন’ এর পাণ্ডুলিপিতেও এই বিষয়ে লেখকের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ রয়েছে। ১৯০৬ইং সনে গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর ওফাত পরবর্তী সময়ে পরিবারে বয়স্ক পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ভারপ্রাপ্তদের যথাযথ প্রযত্নের পরিবর্তে বিরূপ ও বৈরী কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। এতদপ্রসঙ্গে লেখকের বিবরণ-

১৯১৪ইং হইতে আমার মোহ নিদ্রা ভাঙিতে আরম্ভ হয়। যখন দেখি আমার অনুমতি ছাড়া আমার জমির উপর তাহাদের (আমোক্তার) গরুর ঘর ও পুকুর পাড়-----।

রওজা শরীফের সিন্ধি ফাতেহার জন্য যাহা আসিত মুসাফিরখানার এন্তেজাম এর নামে তাহারা (আমোক্তার) নিয়া যাইত। জেয়ারত বাবত খাদেমরা যাহা পাইত তাহা হইতে বাজার খরচ দিয়া যাহা বাঁচিত তাহার এক তৃতীয়াংশ তাহারা নিয়া নিত। বাকী অংশ আমাদের (দরবারের) খরচের জন্য দিত। হযরতের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তির কতক খলিফাগণ সহ ব্যবহার তারতম্য এবং উপেক্ষার দরুণ দশই মাঘ হযরত কেবলার বাড়ী মকামে না আসিয়া নিজনিজ মকামে

গাউছেপাকের ওরশ শরীফ নেয়াজ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সুবর্ণ সুযোগে তিনি দরবারী খলিফা এবং অবস্থাপন্ন অনুরক্ত বিভিন্ন জনগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া টাকা জোগাড় দলীয় মতবাদ ও মনন ভাবজনিত পীরি ছায়র প্রথার প্রচলন করেন।

আমি হযরত কেবলার রওজা মোবারক এবং ওরশ শরীফ এন্তেজামের ভার, তহবিল শূন্য অবস্থায় উপরোক্ত জায় মানিয়া নিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

তাই অগত্যা হযরত কেবলা সমীপে প্রতিকার নালিশ পেশ করিলে, স্বপ্নে জানাইলেন যে, পশ্চিম দিকে বর্তমান দরবার শরীফ স্টোরের স্থানে একটি ঘর করিয়া তোমার মালামালগুলি রাখিলে সমস্ত গোলমাল চলিয়া যাইবে। ১৯২৫ইং সনে এই উত্তর পাইলে ২৬ইং সালে সাত হাত প্রস্থ ও বার হাত দীর্ঘ একখানা বাঁশের ঘর তৈয়ার করিয়া রওজা মোবারকের দরকারী বাত্তি, জ্বালানী তৈল ও অন্যান্য নিজ পারিবারিক খাদ্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মালের একখানা দোকানের পত্তন করি। পরবর্তী সনে দৈবাত সতর্কবাণী জানিয়া রওজা শরীফের আলমারীতে খাদেম সৈয়দ মিঞা সাহেবের হেফাজতে আমার রক্ষিত খেদমতের টাকা তালাশ করিলে, জানিতে পারিলাম যে, মং ১৩৪৩ তেরশত তেতাল্লিশ টাকার আন্দরমাত্র তেতাল্লিশ টাকা মওজুদ আছে। অবশিষ্ট টাকার আন্দর মং ৮০০ আটশত টাকা সৈয়দ আবদুল ওহাব সাহেবের পরামর্শে ধলই নিবাসী আবদুর রহমানকে হাওলাত দিয়াছে। নিজে তিনশত টাকা কাঞ্চনপুরে মহাজনী জমির উপর লাগিয়াত করিয়াছে। কতক টাকা তাহার শ্বশুর গংকে হাওলাত দিয়াছে। কাজেই এই তেতাল্লিশ টাকাই একমাত্র প্রাপ্য মনে করিয়া উঠাইয়া আনিলাম। নিজে অর্ধেক কাঠ পেন্সিলসহ একটি পকেট নোট বহি সঙ্গে রাখিয়া হিসাব রাখিতে আরম্ভ করিলাম। যাহার ফলে খোদার মেহের হিসাব পত্র বুঝিতে সক্ষম হইলাম। এই হিসাবে নানা দুর্গতির ভিতর দিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হইলাম। মাঝেমধ্যে কতক জমা-জমিন যথা মির্জাপুরের তরফ ‘আমিনুল্লা জমরুদ’ এবং কতক খাদ দখলী কৃষি জমা জমিন ইত্যাদি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলাম। [এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক]

বস্তুত এই বিবরণ সমূহের অন্তর্মর্ম কথিত পুনর্বাসনকারী জাতী প্রতিপক্ষের বৈরি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে অছি-এ-গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর সংগ্রামী জীবনের বেদনা গাঁথা এই বিবরণ ‘জবানবন্দী’ হিসাবে এই অধ্যাত্ম কেন্দ্রের গড়ে উঠার ইতিহাসে প্রামাণ্য সাক্ষী হয়ে থাকবে। যাকে প্রতিরোধের প্রয়াসে জ্ঞাতি গোষ্ঠির মধ্যে যারা তাদের সর্বসামর্থকে বিনিয়োজিত করেছিলো তাদের হাতে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীকে কথিত ‘পুনর্বাসন’ এর গল্পগাঁথা নেহায়েত কুমিরের অশ্রু বর্ষনের ন্যায় ফাঁকা ও কপটতায় পরিপূর্ণ এক প্রহসনপূর্ণ ভাষ্য। গাউসুলআজম মাইজভাগুরী ও বাবাভাগুরী কেবলার নেগাহে করম অছি-এ-গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর উপর বরকরার ছিল বিধায় স্বীয় সংগ্রামী চরিত্র, মেধা ও সাহসের সাথে মোকাবিলাপূর্বক কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের সকল জাল ছিন্ন করে তিনি দরবার-এ-গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর শান ও আজমতের সুরক্ষায় সফলতা হাসিল সমর্থ হয়েছিলেন। সকল ধরনের বিভ্রাট ও বিভ্রান্তির আস্তরণ সরিয়ে অছি-এ-গাউসুলআজম মাইজভাগুরী এই মহান অধ্যাত্ম কেন্দ্রের মৌলিক ইতিহাসের ধারাকে পুনরুদ্ধার করে নিজে গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে এই তরিকা দর্শনের লিখিত রূপকে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই কারণেই তিনি লেখক, গবেষক অধ্যাপকদের মূল্যায়নে ‘ধ্রুবতারা’ ‘নিরাপদ সোপান’, ‘মহাজ্ঞানী মুসলমান’, ‘হযরত কেবলার কশফে তাবীর’ প্রভৃতি মর্যাদাপূর্ণ অভিধায় পরিচিতি হয়ে সম্বোধিত হয়েছেন।

আল-মাইজভাগুরী ম্যাগাজিনের [১১০তম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায়] ১৫ থেকে ২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক লেখায় ব্যক্তি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীর পারিবারিক অবস্থান চর্চার সূত্রে হয়, অসম্মানিত ও অপমূল্যায়িত করার নির্লজ্জ প্রবণতাই এই প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। বলাইবাছল্য ১৯০২ইং সনে পিতা সৈয়দ ফয়জুল হক এর মৃত্যুর পর [১৯০২] থেকে যাদেরকে দায়িত্বে নিয়োগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার তদারকি এবং পিতামহ গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর ওফাত [১৯০৬] পরবর্তী সময়ে পিতামহীর উদ্যোগে সহায়-সম্পত্তির দেখভালের জন্য নিয়োজিত আমোজার এর হাতে গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর একক উত্তরাধিকারী পৌত্রকে পুনর্বাসনের শিষ্টাচার বর্জিত, অবাস্তব বক্তব্য প্রদানেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। মাইজভাগুরী তরিকা ও দর্শনের মূলধারাকে আড়াল করে এই সময়ে ফতুহাতের উপসত্ত্ব ভোগী মহল কর্তৃক পরিচালিত জাগতিক স্বার্থনির্ভর কর্মকাণ্ডকে অছিয়ে গাউসুলআজম প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে সোচ্চার ভূমিকাই সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীকে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর নিকট অপছন্দনীয় ও অবাস্তিত প্রতিপক্ষ করে তুলেছিল। বাবা ভাগুরী স্থায়ী পীরের ফযুজাত রহমত হাসিলের ব্যগ্র আকাংখায় যখন নিজেকে সনিষ্ঠ রেয়াজতে ও নিবেদনে নিয়োজিত রেখেছিলেন তাঁর অনুজ ভ্রাতৃকুল তখন গাউসুলআজম মাইজভাগুরী ফতুহাত ভোগের জীবনে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। মাইজভাগুর দরবার শরীফের তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যারা নিজেরাই পরনির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করেছেন তাদের হাতে গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর পরিবারের একক পুত্রবংশের উত্তরাধিকারের পুনর্বাসিত হওয়ার উদ্ভট দাবী অনেকটাই রূপকথার কাহিনীর মতোই এক বায়বীয় চিত্রকল্প।

‘উচ্চ শ্রেণীর তরিকতপন্থীদের জন্য উপকারী পরিচিহিত ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সরাসরি গ্রন্থের আলোচনা পরিহার করে আল-মাইজভাগুরী প্রকাশনা কর্তৃপক্ষকে অপর একটি মাসিক পত্রিকার একটি লেখাকে কেন মধ্যে রেখে পর্যালোচনায় তাদেরকে ব্রতী হতে হয়েছে? এতোদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? দীর্ঘ সময় ধরে পাঠক, লেখক, গবেষক, পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট নন্দিত ও প্রশংসিত গ্রন্থ ‘বেলায়তে মোতলাকা’ প্রকাশের ৫৭ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অনিবন্ধিত একটি সাময়িকীতে আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক এর চারপাশে অবস্থানরত ‘মাওলানা’ ‘আল্লামা’ ‘মুফতীদের’ নবতর এই মূল্যায়ন প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য বস্তুত তাদের ঐ লেখাতেই প্রকারান্তরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ১৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের শেষার্ধে জানান দেয়া হয়েছে- ‘অভ্যন্তরীণ ভাবে অনেক বিতর্কিত বিষয়ের সমাধানের জন্য আমরা ইতিপূর্বে আপনাদের বরাবরে অনেকবার চেষ্টা চালিয়েছি’। মূলত মাইজভাগুরী অধ্যাত্ম শরাফতের মূলধারায় সংরক্ষিত মূল্যবোধে লালিত আওলাদে অছি-এ-গাউসুলআজম মাইজভাগুরীদেরকে প্রতিপক্ষ করে গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর ওফাত (১৯০৬ইং) এর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে আমোজারদের মাধ্যমে সৃষ্ট জাগতিক স্বার্থ সংরক্ষক গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত

বিতর্কিত কর্মকাণ্ড এবং অগ্রহণীয় বিষয় সমূহে বর্তমান প্রজন্মের অতি আগ্রহীদের জিঘাংসায় ‘পাটা-উতার ঘষাঘষিতে’ জাগতিক স্বার্থ বনাম নৈতিকতার স্নায়ু যুদ্ধে নীতির প্রশ্নে অনাপোষি মনোভাবের পরিচালিতদের ভিত্তিমূল অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীকে ‘মরিচের’ ভূমিকায় এনে সৌজন্য, শালীনতা ও লৌকিকতা বিসর্জন দিয়ে অবশেষে কলম ব্যবহারে তাদেরকে সংকোচ ও লজ্জাহীন ভাবে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। কথিত নিবন্ধের ১৭ পৃষ্ঠার ২য় কলামে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন যে তারা নাকি ‘মাঠে ময়দানে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছেন সচেতন আলেম-ওলামা ও শিক্ষিত সমাজের কাছে’। বস্তুত মাইজভাগুরী অধ্যাত্ম শরাফতের মূলধারায় [গাউসুলআজম মাইজভাগুরী কর্তৃক প্রবর্তিত বাবাভাগুরী কর্তৃক অনুশীলিত ও অছি-এ-গাউসুলআজম মাইজভাগুরী কর্তৃক লিখিতরূপে উপস্থাপিত পন্থা বা ধারা] সায়েরপীরি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ‘মাইজভাগুরী আওলাদ’ বা ‘আওলাদে গাউসুলআজম মাইজভাগুরী’ পরিচয়ে মুরিদের বাড়ী বাড়ী, পাড়া, মহল্লায় ঘুরে ঘুরে যারা সায়ের পীরিতে লিপ্ত রয়েছে মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারাই নিজেদের পরিচিতি বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। ১৯৭৫ইং সনে প্রকাশিত ও প্রচারিত ‘জরুরী বিজ্ঞপ্তি’ শীর্ষক একটি ঘোষণাপত্রে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী লিখেছেন- ‘সকলের অবগতির জন্য ইতিপূর্বে বহুবার দৈনিক আজাদী পত্রিকা মারফত, প্রতিবাদলিপি প্রকাশ করিয়াছি। এখনো বলিতে চাই গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর বংশধর আওলাদগণ বাড়ী বাড়ী গিয়া ছায়ের ব্যবসা করেনা, যাহা গাউছিয়ত নীতি বিরুদ্ধ এই সকল ফিকিরবাজ, শঠ, প্রবঞ্চকগণ হযরতের পুত্রবংশ বা হযরতের নামীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মালিক ওয়ারিশ নহে’।

গাউসুলআজম মাইজভাগুরী এবং বাবা ভাগুরী এই অধ্যাত্ম কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠান ও পরিচিতি বিকাশে প্রধান হস্তিধ্বয়ের কেউই এই সায়েরপীরি প্রথাকে কখনোই অনুসরণ করেননি, বরং তাঁরা নিজ নিজ আস্তানা এবং অবস্থানে থেকেই হেদায়ত কর্ম সুসম্পন্ন করেছেন।

এতদপ্রসঙ্গে অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী তাঁর রচিত সর্বশেষ গ্রন্থ ‘মানবসভ্যতায়’ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন-

তৃষ্ণাতুর শরীরের পবিত্রতা রক্ষাকারী এবং জীবনযাত্রা সুগম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তালারী স্বাবলম্বী ও ইবাদতকারী ব্যক্তিরাই পবিত্রতা হাসিল করেন পুকুরে। পুকুর স্বস্থানে বিদ্যমান থাকে কাহারো কাছে যায় না।

সেই রূপ আত্মশুদ্ধিকামী, নিজ সংসার ও পরকালীন মঙ্গলার্থী ব্যক্তিরাই বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব ও খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট ধাইয়া আসে।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন লেখক গবেষক বিশেষত বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশিত বংশলতিকায় গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর বংশধারায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সঙ্গত কারণেই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার দায়ে ভ্রাম্যমান ‘পীর’ সাহেবরা যৌক্তিক অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ হবেন। বস্তুত নিজেদের পরিচিতি প্রকাশে প্রবঞ্চনাপূর্ণ মানসিকতাকে সংশোধিত করে প্রকৃত পরিচয়ে নিজেদেরকে উপস্থাপনের সাহসী, ঈমানী সামর্থ সংরক্ষণ করতে পারলে বিভিন্ন মহলে অনুসন্ধিৎসায় কথিত ব্যক্তিবর্গ প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

হতাশাজনিত মনোভাব কখনো কখনো মানবমনে একধরনের ক্ষুদ্র মানসিকতার জন্ম দেয়। মানব মনস্তাত্ত্বিকতায় পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। বলাইবাহুল্য এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে সাইকোলজিস্টরা একধরনের রোগের লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করেন। এই লেখায় ‘বেলায়তে মোতলাকা’ গ্রন্থে তাদের ভাষায় ‘বিভ্রান্তিকর লেখা দৃষ্টিগোচর’ হলেও সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত না করে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নানান অজুহাতে। উপরন্তু আকিদিগত ভাবে বাতেল ফেরকার লেখালেখিতে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর পুনরুল্লেখ নিজেদেরকে তাঁরা কোন অবস্থানে নিপতিত করেছেন সেই বিষয়ে সচেতন পাঠকবৃন্দ তাদের চিন্তা ও মানসিকতার যথার্থ পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হবেন। মাওলানা আজিজুল হক শেরে বাংলা যে গ্রন্থটি প্রসঙ্গে ‘সুফিবাদ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা সম্বলিত একটি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ’ প্রশংসায় সিক্ত করেছেন। লেখক ও গ্রন্থ উভয় বিষয়ে অপর একজন লেখক রফিক আনোয়ারের অভিমত: ‘তিনি [সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী] ছিলেন মাইজভাণ্ডারী তরিকার এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যাদাতা ও নতুন চেতনার উন্মোচকারী। তাঁর ‘বেলায়তে মোতলাকা’ এক অসাধারণ ধর্ম দর্শন ও আত্মদর্শন। এধরনের বই খুব বিরল। যে কোন শিক্ষিত লোক এই গ্রন্থ পাঠ করলে সম্পূর্ণ বদলে যাবেন’ বলে প্রশংসা মন্তব্য করেছেন সেই গ্রন্থটি আল-মাইজভাণ্ডারী মূল্যায়নে ভ্রান্ত লেখার ভিত্তিতে রচিত একটি গ্রন্থ হিসাবে বিবেচ্য হয়েছে। আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক এর চারপাশ ঘেরা মুফতি আল্লামা ও মোল্লাবৃন্দ সেই গ্রন্থকে অবলীলায় ‘মাইজভাণ্ডারীদের ঈমান আকিদা ধ্বংস করার জল্পন বিষ’ আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন। ‘উচ্চ তরিকতপন্থী’ হওয়ার বদলে নিম্নতর স্তরে নিজেদের অবস্থান নির্ণয়ে ‘উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ’- এর বৈপরীত্যে জ্ঞানের নামে নির্বুদ্ধ পিপাসায় এবং ‘অসাধারণ ধর্ম দর্শন ও আত্মদর্শন’ কে উপেক্ষা বা অবমূল্যায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টগণ কোন প্রকারের ‘বস্তুর দর্শন’ লাভে নিজেদের ব্যগ্রতাকে উচ্চকিত করে রেখেছেন তা সহজেই অনুমেয়। তাদের পরিভাষায় ‘তাঁর হায়াতের স্বল্প সময়ের মধ্যে’ অসংখ্য গ্রন্থ রচনাকারী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর সুস্পষ্ট বক্তব্যের কারণে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে তাদের কাছে এই লেখক অপছন্দনীয় ও অসহনীয় হবেন বৈকি। যেহেতু অছি-এ-গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী ‘ভ্রাম্যমান’ সায়ের পীরি তথা মুরীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সফরকারী ব্যক্তি, যত্রতত্র মাজার তৈরির অসংখ্য ও অন্যায় প্রবণতায় আক্রান্তদের এবং ওরশ হাদিয়ার নামে চাঁদাবাজী কর্মকাণ্ডে লিপ্তদের কর্মকাণ্ডকে তীব্র সমালোচনায় দরবারে গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর প্রেক্ষাপটে তাঁর অনুসৃত নৈতিকতায় সুস্পষ্ট ভাষায় অননুমোদিত এবং পরিহারযোগ্য কর্মতৎপরতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তার আচার আচরণে ও প্রায় প্রতিটি লেখায় স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, প্রতিবাদলিপি পুস্তিকা প্রকাশপূর্বক তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে এই অপতৎপরতায় লিপ্তদেরকে প্রতিরোধে সর্বাত্মকভাবে সচেতন ছিলেন। ফলে জাগতিক স্বার্থহানির আশংকায় সংশ্লিষ্টগণ লেখক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর নিন্দা ও সমালোচনায় লিপ্তদের সাথে নিজেরা সম্পৃক্ত থাকবেন এটি অস্বাভাবিক নয়। ‘যতই করিবে পাপ-বাবাই করিবে মাপ’ কিংবা ‘পাপ করি খোদার কাছে, মাপ করিবেন গাউছে ধন’- এই জাতীয় ফেরকার দলীয় ব্যক্তিদেরকে অসীম সাহসে প্রতিরোধ করে মাইজভাণ্ডারী

তরিকা ও দর্শনের মৌলিক পরিচয়কে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী পাঠকদের সম্মুখে উন্মোচন করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই তাঁকে ‘মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচক’ অভিধায় পরিচিতি করা হয়েছে।

বাতেল ফেরকার অনুসারী চিহ্নিত মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন ও মাওলানা মুজিবুল্লাহ কাশেমী এর মতধারায় প্রভাবিত হয়ে প্রমুখের বক্তব্যে যারা উজ্জীবিত হয়ে নিজেদেরকেও তাদের মতধারায় সহযাত্রী হিসাবে शामिल করতে চান বস্তুত সেই চিহ্নিত মহলকে প্রতিরোধ করেই মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও দর্শনকে সূচনা সময় থেকেই পথ চলতে হয়েছে। গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশিত পন্থার ভিত্তিতে অনুসৃত ‘ফ্যাসাদ পরিহার কর, আপন হালতে থাকিয়া যাও’ পথে তথা ‘ফ্যাসাদ’ পরিহার করে সত্যকে প্রকাশে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখাই প্রকৃত মাইজভাণ্ডারীদের পবিত্র দায়িত্ব। ধর্মের ভিত্তিতে একেশ্বরে বিশ্বাসীদের একমত্যে তাওহীদ তথা একেশ্বরবাদ এবং দ্বীন বা ধর্ম এই দুইটি শব্দের সমাহারে ‘তওহীদে আদিয়ান’ নামাকরণ করা হয়েছে। মানবের প্রকৃতিগত সত্তায় সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের আলোকে ধর্ম চর্চাকারী তথা ভিন্ন ভিন্নভাবে আচার ধর্মে অনুসারীদের উদার প্লাটফর্ম হিসাবে ‘তাওহীদে আদিয়ান’ চেতনার পোষক হিসাবে প্রাচীন সময়ে হযরত বু’আলী কলন্দর [ভারতের কলি শরীফে ও পানি পথে উভয় স্থানে তার মাজার রয়েছে] এই চেতনার অনুসারী ছিলেন। মূলত প্রকৃতিগত সত্তায় সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসের আলোকে ধর্মচর্চাকারী থেকে শুরু করে সকল শ্রেণী গোষ্ঠির কাছে এই চেতনা গ্রহণীয় বিবেচিত হয়ে এসেছে। শ্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসবোধের ভিত্তিতে অভিন্ন চৈতন্য সৃষ্টির এই বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা গঠন করার মতো অন্যতম উপযোগী অবলম্বন হিসাবে মানবসভ্যতা বিকাশের ধারাবাহিকতায় এই চেতনার প্রভাব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবী, রসুলসহ ওলীয়ে কামেলীনদের কর্মপন্থায়ও পরিলক্ষিত হয়েছে।

খাতেমুনবীয়িন, রাসূলে মকবুল (দ.) রাহমাতুল্লিল আলামীন এর সর্বব্যপ্ত উদারতায় পূর্ববর্তী সকল নবী (আ.) এর আচার ধর্মের কল্যাণকামী বিধান সমূহ প্রত্যাখ্যানপূর্বক বর্জনের পরিবর্তে ধর্মের মৌলিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় সমূহকে তাঁর অজুদেপাকে শানে রেসালত ও শানে বেলায়ত এর যুগপৎ বৈশিষ্ট্য সমূহ অনুমোদন করে ইসলামের পরিপূর্ণতা সাধনপূর্বক মনোনীত ধর্ম হিসাবে ‘আল ইসলামকে’ মহান আল্লাহপাকের দরবারে মকবুলিয়তের জন্য উপযোগিতা প্রদান করেছিলেন। নবী-এ-আখেরুজ্জাম্মা রাহমতুল্লিল আলামীন এর পক্ষ থেকে বেলায়তের বিবর্তন ধারায় ‘গাউসুল আজমিয়তের’ সর্বোচ্চ মকামের সূত্রে মোহাম্মদী মসরবে ‘বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী’ ধারায় যুগের প্রবর্তক ‘গাউসুলআজম এপতেতাহিয়া’ পীরানে পীর দস্তগীর মহিউদ্দীন শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এবং পরবর্তীতে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে আহমদি মসরবে ‘বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদি’ যুগের প্রবর্তক ‘গাউসুলআজম এখতেতামিয়া’ মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) যুগোপযোগিতায়, ইসলামের মৌলিক চেতনার বিকাশ সাধনে রাসূলেপাকের (দ.) পক্ষ থেকে উভয় অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বই বেলায়তে ওজমার তাজের অধিকারী হওয়ার অনন্য সৌভাগ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। ‘চেরাগে উম্মতানে আহমদি’ গাউসুলআজম মাইজভাণ্ডারী খাতেমুল অলদ তথা

গাউসুল আজমিয়তের ভিত্তিতে শেষ যুগশ্রুতি হিসাবে খাতেমুলবীযিনের অনুমোদিত প্রদর্শিত ধারায় ও নির্দেশিত পন্থায় পূর্ববর্তী সকল তরিকার কল্যাণকামী বৈশিষ্ট্য সমূহকে ধারণপূর্বক সর্বতরিকার বেষ্টনকারী হিসাবে ‘মাইজভাগুরী তরিকা’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের শাস্তত শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে জাতি-ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলের অন্তর্ভুক্তির অবকাশে মানবজাতির জন্য অভূতপূর্ব ঐক্যমঞ্চের উপযোগিতা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বস্তুত এই সর্বব্যাপ্ত উপযোগিতা রচনায় বহুধা হেকমত অবলম্বনের সাথে সৃষ্টির সূচনা সময়কাল থেকে অব্যহতভাবে প্রচারিত ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তথা শ্রুতায় বিশ্বাসীদের সমন্বিত চেতনার ধারা তৌহিদে আদিয়ানকে মূল লক্ষ্য হাসিলে অন্যতম হেকমত বা কার্যকর কৌশল হিসাবে মাইজভাগুরী তরিকায় আত্মস্থ করা হয়েছে।

মাইজভাগুরী অধ্যাত্মধারার বিরুদ্ধাচারে লিগুদের সাথে সুর মিলিয়ে ‘আবদুল’ এবং ‘খালকুল’-উভয় শব্দে অনুপ্রাসের সমিলের আকর্ষণকে পরিহার করে আলোচ্য শব্দের অর্থ জানতে আগ্রহী বা অনুসন্ধিৎসু হলে সংশ্লিষ্ট মহল তওহীদে আদিয়ান প্রশ্নে বিভ্রান্তির ঘোর কাটিয়ে স্বাভাবিক বোধোদয়ে ফিরে আসতে সমর্থ হতে পারেন।

কথিত পুনর্বাসনের রূপ কথকতা

আল-মাইজভাগুরী ডেস্ক-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধে লেখক হিসাবে মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীকে যতটা একদেশদশীতায় আক্রান্ত মনোভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে তার চাইতে অধিকমাত্রায় গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর ‘সম্পত্তি’র উত্তরাধিকার পরিচয়কে কল্পিত কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা সহকারে সত্যতা বর্জিত বিষয়সমূহ সহ উপস্থাপন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়ায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপদস্থ ও অপমানিত করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে প্রবলভাবে।

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী যিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সে এই অধ্যাত্ম কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান অধ্যাত্মপুরুষ, পিতামহ গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর নামে তাঁর স্মৃতির স্মারক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এলাকায় একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার মানসিক সামর্থ্য সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নও করেছিলেন। ১৯১৯ সালে ২৩ বছর বয়সে বিবাহ, ১৯১৮ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান তৎপরবর্তীতে সম্বন্ধ ত্যাগ করে গণসভ্যতা এবং বিভিন্ন সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯২১-২২ সনে বার্মা-কলিকাতা-হুগলী, পণ্ডিচেরী, দিল্লী, আগ্রা ও আজমীর শরীফ ভ্রমণ এবং ১৯২৪ইং সনে দরবার পরিচালনায় সার্বিক দায়িত্ব তিনি এককভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এতকিছু করার সামর্থ্য সংরক্ষণ করার পরেও ইতোপূর্বে নিয়োজিত ‘আমোক্তারবন্দ’ কর্তৃক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীকে ‘পুনর্বাসনের’ (?) উল্লিখিত বিষয়টি সর্বাংশে ঈর্ষণীয়, সংকীর্ণতায় আক্রান্ত মনোভাবের একধরনের নির্লজ্জ প্রকাশ। গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর ওফাত পরবর্তী সময় থেকে হামলা-মামলাসহ নানাবিধ অনৈতিক অমানবিক নিপীড়ন প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করে সর্বক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসাবে অছি-এ-গাউসুলআজম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরীর একক অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সাবজজ আদালত থেকে শুরু করে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে চূড়ান্তভাবেই স্বীকৃত হয়েছিল। এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক গ্রন্থে প্রকাশিত

নিম্নোক্ত বিবরণটি বাস্তব এই ইতিহাসকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপনে সমর্থ হবে।

ইতিপূর্বে ইংরেজি ১৯৩৭ সনে ওরশ শরীফ বন্ধ হওয়ার তিন বছর পর সৈয়দ আবদুল ওহাব গং সৈয়দ আবুল বশর মিঞার সহায়তায় ওরশ ও রওজা শরীফ উল্লেখ সাবজজ আদালতে আমার বিরুদ্ধে তিন বছরের ওয়াশিলাতের একটি মামলা দায়ের করে। মামলা জ্ঞান বিশারদ মুন্সী আবদুল গণি আমি একজন অংশীদার শালিশের নাম মৌলবী আলা মিঞা গং বিন্যা করিয়ে আমার মধ্যস্থতায় কাজ হইয়াছে এখন তলবে দিতেছে ন অজুহাতে প্রাপ্য টাকা পাইবার দাবী করে। ১৯৩৮ইং সনে লাইব্রেরী ঘর ভাঙ্গিলে, ক্ষতিপূরণ ও দখল সাব্যস্তের জন্য ফটিকছড়ি আদালতে আমার দায়েরকৃত মামলা পরের সনে সোলেহনামা নিষ্পত্তির পর ছয় মাসের আন্দর সৈয়দ গোলাম সোবহান সাহেব মারা গেলে নিষিদ্ধ স্থানে কবর দিয়া সোলেহনামার শর্ত ভঙ্গ করেন। সাবজজ আদালত শালিশী তারিখ ১৯৩৭ইং দৈবাত ওরশ শরীফ বন্ধ পড়ায় এবং পার্টনারশিপ কোন দলিল প্রমাণ অভাবে, ভুয়া অবাস্তব বিধায় ডিসমিস করেন। পরে সদর জজকোর্টে আপিল করিলে তাহাও নাকচ হয়। অতপর কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকা হাইকোর্ট ৬/৬/৪৯ইং তারিখে সময় খরচ আপিল ডিসমিস করেন। ‘তাহারা হযরত শাহ আহমদ উল্লাহ সাহেবের আওলাদ ওয়ারিশ নহে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন আওলাদ’ বিধায় মর্মমতে আমার প্রাইভেট রাইট নিষ্পত্তি সাব্যস্ত হয়। চট্টগ্রাম সদর এস.ডি.ও. মহোদয় কোর্টে ১৯৫৪ইং সালের ২০/১ ও ২২/১ তারিখে রাইভেল ওরশ শরীফ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [পৃষ্ঠা ২২ প্রথম প্রকাশ]

এই ক্ষেত্রে স্মর্তব্য অছি-এ-গাউসুলআজম খাদেমুল ফোকরা মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী পারিবারিক ধারায় গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর শুধুমাত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বই নয় বরং

১. পিতামহের একান্ত সান্নিধ্যে স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও খেদমত সোহবতের ফয়জ বরকতপ্রাপ্ত
 ২. প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী বংশধর
 ৩. গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর একমাত্র পুত্র মৌলানা সৈয়দ ফয়জুল হক শাহ এর একমাত্র বিদ্যমান পুত্র
 ৪. হযরত আকদাছের সাজ্জাদানশীন বিধায় সর্বদিক থেকে সুসংহত, সমৃদ্ধ হয়ে বংশধারায় একক এবং স্থায়ী যোগ্যতার অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।
 ৫. গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর জাহেরা কালাম ‘হামারা দেলা ময়না নবাব হায়, হামারা দেলা ময়না সুলতান হায়’ সূত্রে অর্জিত সুলতান-এ-সালতানাতে দরবারে গাউসুলআজম মাইজভাগুরীর অধিকার ও কর্তৃত্বে দরবারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও লেখনীসমূহ তিনি পরিচালনা করেছিলেন।
- এই বিষয় সমূহকে অগ্রাহ্যকারী মাইজভাগুরী অধ্যাত্ম শরাফতের প্রতি কতটা আনুগত্যের তথা আদবের সংরক্ষক হিসাবে নিজের পরিচয় নির্ধারণে সমর্থ থাকবেন এবং ‘মাইজভাগুরী’ পরিচয় ধারণের যোগ্যতা সংশ্লিষ্টগণ কতটুকু সংরক্ষণ করেন সেই প্রশ্নটি নেহায়েত অমূলক নয়। [চলমান]

সরকারী সফরে ‘মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী’ মিশরে

• অধ্যাপক এ. ওয়াই. এম. জাফর •

(৫ম কিস্তি- শেষ পর্ব)

মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক ও শিল্পী সৈয়দ আদিল মাহবুব আকবরীর মিষ্টি শাসন ও পাহারায় অনেক লোভনীয় রসালো খাওয়ার খেতে না পারলেও শহরগুলোর অন্যতম হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ নীলনদঘেরা মিশরের কায়রো নগরীর বিখ্যাত অপেরা হাউসে মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর মনোমুগ্ধকর সার্থক পরিবেশনায় মেজাজ অত্যন্ত ফুরফুরে। ডাইনিং হল থেকে বের হতে স্থানীয় সময় রাত প্রায় একটা বাজলেও কেউ কিন্তু টায়ার্ড নয়। আমাদের দলনেতা, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তাঁর রুমে ঢুকার আগে উপসচিব আর আমাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানালেন সুন্দর একটা অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য। তিনি বললেন, সুফি মিউজিক গ্রুপ হিসেবে মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীকে Select করে আমরা আসলে সঠিক কাজটিই করেছি। সাথে আপনার নিয়ন্ত্রণে লালন শিল্পীদ্বয়কে নিয়েও ভালো করেছি। কারণ মাইজভাণ্ডারী গানে আপনাদের দলের সর্বাঙ্গীন যে পারঙ্গমতা তা পাশাপাশি অন্যদের কাছ থেকে পেতাম কিনা সন্দেহ। হাই কমিশনার সাহেব কিন্তু আমাদের সম্মানে কালকে ইফতার আর ডিনারের যে আয়োজন করেছেন সেখানেও মাতিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখবেন, কাল সকাল বেলা আমরা পিরামিড দেখতে ও মিউজিয়ামে যাবো রেডি থাকবেন। Good Night, বলে তিনি দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে গেলে আমরা দু’জন প্রীত মনে যার যার রুমে চলে আসলাম। তখন রাত সোয়া একটা।

চোখের পাতা এক হতে না হতেই মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মগজিঃআঃ) সারা ঘর আলো করে উপস্থিত। মৃদু হেসে বললেন ‘মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীকে দিয়ে মুনিব একটা বিশাল কাজ করিয়েছেন। যেমন ২০১০ সালে করিয়েছেন প্রথম আন্তর্জাতিক সুফি কনফারেন্স। এভাবে দরবারের খেদমত করলে তো মুনিব রাজী হন! তন্দ্রা ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে, মুনিবের কদমে তসলিম জানালাম। পর্দা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাতে চোখে পড়লো জাযত কায়রো নগরীর ব্যস্ততা রমযানে তারা রাতে ঘুমায় না।’ এক সাথে সেহরী খেয়ে ঘুমায়। দূরের সেই কায়রো টাওয়ারের সার্চ লাইট ধীরগতিতে এগিয়ে এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যেন বললো কায়রো তোমাদের পূর্ব পুরুষের শহর, মনে রেখ। ভালো থেকো। দেশকে ভালবেসে সং থেকে কাজ করো। তোমাদের মুর্শিদ তোমাদের দেখবেন। আল্লাহ তোমাদের সহায় হবেন। বিছানায় ছটফট করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরদিন স্থানীয় সময় সকাল ৯টা। দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ।

ভেতরে আসতে বলার সাথে সাথে উপসচিব পরিমল দাশকে সহাস্যে রুমে ঢুকতে দেখে উঠে স্বাগত জানালাম। বললেন, মিশর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় হোটেল পরিবর্তন করে আরে অভিজাত আধুনিক ও উঁচুমানের হোটেল বুক করেছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি আসবে, রেডি হয়ে নিন। সফরে যারা রোজা রাখেনি (অমুসলিমসহ) সবাই ইতিমধ্যে প্রাতঃরাশ সেরে রুমে চলে এসেছে। বলে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা বের হতে পারবে। আমিও বিশ মিনিটের মধ্যে হোটেল Reception এ পৌঁছে দেখলাম তখনো অতিরিক্ত সচিব এসে পৌঁছেন নি। তিনি আসতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কায়রোর সেই বনেদী হোটেল নীলনদ পাড়ের ‘উম্মে কুলসুম’ ছেড়ে মিশর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। পনের মিনিট পরেই আমরা নীলনদের অনতিদূরের অভিজাত হোটেল ‘পিরামিড’ পৌঁছে গেলাম। আধুনিক স্থাপত্য শৈলী ও মিশরের ঐতিহ্যের ছাপ সম্বলিত Reception, লবি, হল, এন্ট্রি ইত্যাদিতে সময় বেশি লাগলোনা। যে যার Key Card নিয়ে রুম গুছিয়ে নিতেই আমাদের মিশর গাইড, দরবারের ভক্ত, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ শেষ পর্বের ছাত্র বেলাল উদ্দিন চৌধুরী এসে হাজির। বললো গাড়ি রেডি। পনের মিনিটের মধ্যে স্টার্ট করতে হবে পিরামিড দেখতে যাওয়ার জন্য। যেতে প্রায় আধ ঘণ্টার মত সময় লাগবে। মনে রাখবেন আজ জুমাবার, আমরা ফিরতি পথে জুমা পড়বো। সোয়া দশটায় বের হতে হবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মাহমুদ সবাইকে গাড়িতে অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে গিজা পিরামিড চত্বরে গিয়ে পৌঁছলাম। শহরের রাস্তা থেকে একশ ফিটের মতো উপরে উঠলাম। স্থানের নাম মেমফিস। তার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত সাক্সারায় আরো পঞ্চাশ ফিট উপরে গিজা পিরামিড চত্বর।

আমরা এক এক জনের জন্য ১০০ মিশরীয় মুদ্রা দিয়ে টিকেট কেটে সিকিউরিটি গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় ধূসর মরুভূমি পশ্চিম পাশে, চিক্ চিক্ করছে রোদের ছটায়। সুযোগ বুঝে মিশরীয় কিছু হকার রোদ চশমা, ক্যাপ গছাতে ও ক্ষুদ্রাকার পিরামিডের Antiqs বিক্রি করার জন্য চেপে ধরছে। চারগুণ দাম হাঁকিয়ে শেষ পর্যন্ত একভাগ দামে গছাতে পারলেও যেন তার লাভ। গেট পার হয়ে আমরা পনের জনই ভেতরে প্রবেশ করার পর আন্তে আন্তে পিরামিডের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। মিশরের পিরামিডগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পিরামিডগুলোই কায়রোর উপকণ্ঠে মরুভূমির কোল ঘেঁষে সমান্তরালভাবে আরো পঞ্চাশ ফিট বা তারও বেশি উপরে মূল ভিত।

গিজা পিরামিড চত্বরে স্থাপিত ৩টি বিশালাকার পিরামিড ডান

দিক থেকে বাম দিকে অবস্থিত। বাম দিকে প্রথমটি ‘খুফুর পিরামিড’, তার পরেরটি ‘খাফের পিরামিড’ ও সর্ব ডানেরটি ‘মেনকাউর মিরামিড’। অবশ্য এই মেনকাউরের পিরামিডের সামনে আরো ছোট ছোট তিনটি পিরামিড সংযুক্ত রয়েছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত মিশরে ১৩৮টি পিরামিড আবিষ্কৃত হয়েছে। এর বেশির ভাগই নির্মিত হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যকালীন সময়ের ফ্যারাওদের রাজত্বকালে তাঁদের নিজেদের ও পত্নীদের সমাধি সৌধ হিসেবে। মিশরের পিরামিডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো পিরামিড ‘জোসারের পিরামিড’ খ্রিস্টপূর্ব ২৬৩০-২৬১১ অব্দে নির্মিত, তৃতীয় রাজবংশের রাজত্বকালে। এই পিরামিডই বিশ্বের প্রাচীনতম মসন প্রস্তর নির্মিত স্থাপনা বলে মনে করা হয়। গিজায় অবস্থিত বাম দিক থেকে ডান দিকের পর পর তিনটি পিরামিডের মধ্যে প্রথম ‘খুফুর পিরামিড’ই বৃহত্তম এবং প্রাচীন বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি স্থাপনা বলে চিহ্নিত।

প্রাচীনকালে মিশরবাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো মৃত্যুর পরও তাদের আত্মা বেঁচে থাকে। তাই সেখানে জীবনটা যাতে নিরুপদ্রবে কাটানো যায় এবং আরাম আয়েশ ও খাদ্য পানীয়ের যেন ঘাটতি না পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রেখে তা প্রচুরভাবে সমাধি অভ্যন্তরে রাখার ব্যবস্থা করা হতো। ব্যক্তি যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতো, সেখানে তত গুরুত্বের সাথে খাদ্যদ্রব্য ও ব্যবহার্য সামগ্রীর সমাহার বেশি হতো। কারণ তারা মনে করতো, লাশ বা মৃতদেহের টিকে থাকার উপরই নির্ভর করে আত্মা বেঁচে থাকা এবং তাই লাশকে তারা ‘মমি’ করে রাখতো এবং কবরে সমাহিত ব্যক্তিটি কত বিশাল ক্ষমতা আর বৈভবের মালিক তা জাহির করার জন্যও এ বিশালাকৃতির সৌধ বা পিরামিড তারা তৈরি করতো। তাই ক্ষমতাস্বার্থে ফ্যারাওদের সমাধি সৌধ বা পিরামিডের বিশালত্ব লক্ষ্য করা যায়। আমরা প্রথমে পিরামিডের পাদদেশে গিয়ে এর স্থাপনা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনেক সময় পার করার পরও মাথায় কিছু ঢুকলোনা শুধু বাহ্যিক স্থাপনার বিশালত্ব ও উচ্চতার আনুমানিক ধারণা করে প্রাচীনকালের এই নির্মাণ শৈলীতে শুধু হতবাকই হলাম। কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হলাম এরা এ সংক্রান্ত কোন বই আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীতে ছাপিয়ে কেন পর্যটকদের দিচ্ছেনা।

তীব্র রোদে ক্লান্ত তখন আমরা। তারপরও পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা। ভাবতে কেমন একটু গর্ব অনুভব হলো। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে সেল্ফি তোলা হুড়াহুড়ি দেখে ভীষণ আনন্দ লাগলো। গ্রুপ হয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত সবাই। অতিরিক্ত সচিব, উপসচিব এবং নিজেও যে এ বয়সে কম যাননা তা অতিরিক্ত সচিবই বললেন। আমরা তিনজনও অনেক ছবি তুললাম পিরামিডকে পেছনে রেখে এক এক সময় এক এক ভাবে। হাঁটতে হাঁটতে মরুভূমির কিনারায় যেখানে আমাদের সমুদ্র সৈকতের দোকানগুলোর মতো ছোট ছোট দোকান দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে উটের মালিক সওয়ারী সওদা করার জন্য। আমাদের অতিরিক্ত

সচিব প্রথমে একজনের উটে সওয়ারী হলেন কিন্তু এত উঁচু, ভয়ে থাকতে পারলেন না। কিন্তু উপ সচিব অনেকক্ষণ থাকলেন উঠের পিঠে। ওদিকে আমাদের হান্নান, নির্মল দাশ, বলাইও কম যায় না। সবাই যখন উট নিয়ে বা উটের পিঠে সওয়ার হওয়ার বা উটের পাশে দাঁড়িয়ে কেউবা আরব নাগরিক সেজে সেল্ফি তুলছিল এ সময় হঠাৎ Help Help আত্নাদে দূরে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের শিল্পী আর হাবিবকে দু’জন লোক ঘোড়ার পিঠে উঠাতে চেষ্টা করছে আর সে চিৎকার করছে। তা দেখে আদিল, টিংকু, আর বাবুল শীল দৌড়ে যেতে তারা আবুকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়ে মিশরীয় মুদ্রা দিতে বললো। আদিল টাকাটা দিতে আবুকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল তারা। পরে জনলাম ফ্রি ফ্রি বলে চিৎকার করে মানুষ আকর্ষণ করছিল বলে সে উঠতে গিয়েছিল। তখন বেলাল বললো-আসলে সবাইকে তার আগে থেকে সতর্ক করা উচিত ছিল। এ সমস্ত জায়গায় মাঝে মাঝে ঠগবাজ লোক ওং পেতে থাকে। দল ছাড়া কোন লোক পেলে ঠকিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে মরুভূমির ভিতর নিয়ে যায়। সব হাতিয়ে রেখে তারপর ছেড়ে দেয় তাকে একাকী মরুভূমির ধূ ধূ প্রান্তরে। তখন প্রায় বারটা বাজে। মন সবার খারাপ হয়ে গেল। রোদের তীব্রতা থাকলেও তেমন অধিক গরম অনুভব হচ্ছিল না। শরীরে কোন ঘামও ছিল না খোলা আকাশের নীচে রোদের তীব্রতায় এক ঘণ্টার বেশি সময় কাটানোর পরও। জুমার সময় প্রায় সন্নিহিত বলে আমরা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পনের মিনিটের মধ্যে একটি মসজিদে প্রবেশ করলাম।

নামাযের পর পরই কায়রোর মূল কেন্দ্র ‘আরব বসন্ত’খ্যাত সেই ‘তাহরির স্কয়ারে’ অবস্থিত কায়রো যাদুঘরে এসে পৌঁছলাম। তখন স্থানীয় সময় দুপুর দুটোর কাছাকাছি। যেহেতু তিনটায় যাদুঘর বন্ধ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি টিকেট সংগ্রহ করে যাদুঘরে ঢুকে পড়লাম। দ্বিতল বিশিষ্ট বিশাল হল ঘরের পুরো জায়গা জুড়ে মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শন, চিত্র ও সামগ্রী দিয়ে সাজানো। প্রাচীন মিশরের মমির ছাপ তৈজসপত্রের নমুনা গহনা। ফেরাউন, কারুনের রাজত্বের চিত্র। রাণী ক্লীওপেট্রার রাজত্বের আলামত। সেই ঐতিহাসিক সময় ও কালকে উন্মোচিত ও দর্শনোপভোগ্য করে রাখার চেষ্টার সর্বোত্তম ছাপ পরিপুষ্ট। কিন্তু সময়ভাবে সে সব খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ না থাকায় আমাদের মূল লক্ষ্য ফেরাউনের লাশ দেখার জন্য পুনরায় টিকেট সংগ্রহ করে ফেরাউনের লাশ (মমি) রাখা ঘরে প্রবেশ করলাম। এ নির্দিষ্ট অংশে ফেরাউনসহ তৎকালীন অন্যান্য কয়েকজন রাজা বাদশার লাশও রয়েছে। ফেরাউন বংশের দ্বিতীয় রাজা। সে সময়ে রাজাদের উপাধী ছিল রামাসিস। এ সেই ফেরাউন যে হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর উম্মতদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে গিয়ে মুসা (আঃ) এর ফরিয়াদে আল্লাহর হুকুমে লোহিত সাগরের মাঝে রাস্তা তৈরি হয়ে পড়লে তিনি তাঁর উম্মতদেরকে নিয়ে ওপারে চলে যান আর ফেরাউন তার

দলবল নিয়ে লোহিত সাগর পুনরায় পূর্ববৎ হয়ে পড়লে সাগরের অঁথে জলে ডুবে মারা যায়। সেই লাশ দেখার পর থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। শুনেছি ফেরাউন অনেক লম্বা ছিল অথচ আমাদের বেলাল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললো সে নিজে পূর্বে যখন যাদুঘরে এসেছিল সুযোগ বুঝে হাত দিয়ে মেপে দেখেছে লাশটি লম্বায় পাঁচ হাত চার আঙ্গুল, মানে সাধারণ মানুষের মতোই, আমরা যা সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছি। ১৯৮১ সালে এ লাশের সংস্কার ও নিরীক্ষণ করানোর জন্য মিশর সরকার ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও গবেষকগণের গবেষণায় ধরা পড়ে ফেরাউনের বাম হাত সামনের দিকে বাড়ানো অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। যা প্রমাণ করে তার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিলনা বরং আকস্মিক তার সামনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে বাঁচতে চেয়ে হাত প্রসারিত করেছিল তাছাড়া পরীক্ষাগারের প্রধান ডাক্তার মুরিস তার শরীরে সাগরের লবণাক্ত পানির প্রভাব বিদ্যমান বলে মন্তব্য করেছেন, যা ফেরাউন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সমস্ত সত্য জাঙ্জল্যমান রূপে প্রতিভাত করে। তারপর আমরা ঐ কক্ষে রক্ষিত অন্যসব রাজা রাণীদের মমি দেখতে দেখতে সময় শেষের ধ্বনি বেজে উঠায় তাড়াতাড়ি যাদুঘর থেকে বের হয়ে স্মৃতিকে জাগরুক করে রাখার জন্য কিছু ছবি ধারণ করে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সাড়ে তিনটায় হোটেল পিরামিজায় পৌঁছে গেলাম।

অনেকটা ঘুমে অচেতন অবস্থায় দরজায় ঠক ঠক শব্দ আর উপসচিবের কথা শুনে বুঝলাম তাড়াতাড়ি বের হতে হবে বাংলাদেশ ডেলিগেটের সম্মানে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইফতার ও ডিনার পার্টিতে অংশগ্রহণের জন্য। সচিব, উপসচিব ও আমি যখন নিচে নেমে আসলাম ততক্ষণে সবাই হাজির। দূতাবাসের গাড়িতে আমরা পনের মিনিটেই পৌঁছে গেলাম।

হাই কমিশনার, এ্যাটাসে, ফার্স্ট সেক্রেটারী ছাড়াও UNFPA'র আরব দেশসমূহের রিজিওনাল এ্যাডভাইসার তাঁদের সহধর্মীনিহ সহকর্মীজন বাঙালি ব্যবসায়ীর সাথে পরিচিত হলাম। সবাই গত রাতের অনুষ্ঠানের মতো সেখানেও যেন মাইজভাণ্ডারী গান ও লালনগীতি দিয়ে রম্যমানের এই পবিত্র দিনে মোহিত করতে পারি সে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। দু'দিন পরে ইফতারে এবং ডিনারে এ সুস্বাদু লোভনীয় মুখরোচক বাঙালি খাবার খেয়ে যারপর নাই আনন্দিত সবাই। খাওয়া শেষ হতে না হতে টেবিল চেয়ার কার্পেটের উপর থেকে সরিয়ে শিল্পীদের জন্য গানের পরিবেশ তৈরি করা হলো। এখানে সমবেত কণ্ঠের গান নয়। একক কণ্ঠে আদিল, আবু, হান্নান, বাবু পর পর মাইজভাণ্ডারী গান এবং কোহিনূর ও সুমন ২টি একক ও একটি দ্বৈত কণ্ঠের গান পরিবেশন করলো। পুরো সময় স্বল্প আলোর বর্ণিল ছটায় বাণীর স্বর্গীয় আবেদনে কখন যে একটি ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে পুরো ঘর পুনরায় আলোকিত না হলে বলা দুষ্কর ছিল।

তৃতীয় দিন মিশরের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের Schedule এ পূর্ব থেকে কোন Programme না থাকায় আমরা জিয়ারতের জন্য দিনটিকে আমাদের মিশর প্রতিনিধি বেলালের সহযোগিতায় বেছে নিলাম। ঠিক দশটায় মাইক্রো হোটলে এসে পৌঁছলে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। মিশরের কথা ভাবতেই যেমন পিরামিড, যাদুঘর, নীলনদের কথা মনে আসে তেমনি খোদাভীরু মানুষের মনে জাগ্রত হয় ইমাম হোসাইন (রাঃ), আলী জয়নাল আবেদীন (রাঃ), সৈয়দা জয়নাব (রাঃ), সৈয়দা নাফিসা (রাঃ), সৈয়দা আয়েশা (রাঃ), ইমাম শাফেয়ী (রাঃ), আবুজর গিফারী (রাঃ), যুন্নুন মিশরী (রাঃ), হযরত রাবেয়া আদভীয়া, আমর ইব্বনুল আস, জালাল উদ্দিন সয়ুতি, সাত বদর যুদ্ধের শহীদদের মাজারসহ হযরত ইউসুফ, ইব্রাহিম, মুসা ও রাসূল করীমসহ অনেক নবী রাসূলের স্মৃতি ধারণ ছাড়াও আল্লাহর তজল্লি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বা বয়ে চলা অসংখ্য নিদর্শন। আমরা শুধু সময়ভাবে উপরোল্লিখিত মাজারসমূহ জিয়ারত করতে সক্ষম হলাম বিকেল সোয়া তিনটার মধ্যে।

চতুর্থ দিন নীলনদ দর্শন, ভ্রমণ ও মার্কেটিং এর জন্য নির্ধারিত ছিল। হোটেল থেকে সামান্য দূরে নীলনদ। আমরা বিশাল ডাবলওয়ে রাস্তার প্রশস্ত ঝামেলাহীন ফুটপাথ ধরে হেঁটে গেলাম। দক্ষিণ পাড়ে বড় বড় সব পাঁচ তারকা হোটেল সামনে বিশাল চার লেন রাস্তা শত শত গাড়ীর চলাচল কিন্তু কোন জ্যাম নেই। দুপুর বারটা থেকে একটা পর্যন্ত বোট নীলনদের বুকে ভ্রমণ হলো। এই সেই নীলনদ যা বছরে একটি নারীকে বিসর্জন না দিলে শুকিয়ে যেত। পরে মিশরবাসীর অনুরোধে হযরত উমর (রাঃ) নীল নদকে একটি চিঠি দিয়ে লিখেন 'তুমি যদি আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত হয়ে থাক তাহলে এ চিঠি তোমার বুকে পড়ার সাথে সাথে পানি দেবে আর যদি তোমার ইচ্ছায় প্রবাহিত হও তা হলে প্রয়োজন নেই।' সেই থেকে নীল নদ আর কোনদিন শুকায়নি কানায় কানায় টাইটমুর পানি। শুকনো মৌসুমেও। আরো অনেক কথা। চোখ জুড়িয়ে, মন ভরিয়ে এনেছি শ্রদ্ধায় ভালবাসায় প্রাণের তাগিদে। পরে সময় সুযোগে বিস্তারিত লেখার আশা রয়েছে।

পঞ্চম দিন রাত দেড়টায় আমরা কায়রো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তারপরের দিন বিকেল ৫টায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামলাম। বের হতে এবারও কোন ঝামেলা হয়নি বাংলাদেশ ডেলিগেট হিসেবে। সচিব ও উপসচিব বিদায় সম্ভাষণে বলেই ফেললেন আপনারা টু হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল। অনেক ভাল লাগছে দেশে ফিরতে। বলতে পারবো। দশ মিনিটের মধ্যে শিল্পকলার গাড়ি আমাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলো এবং দেড়ঘণ্টা পর শিল্পকলায় ফিরে আল্লাহর কাছে শোকর করলাম। সমাপ্ত



Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari (KA) Trust

মিয়ানমারে রাখাইন নিরাপত্তা অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হোক

- হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

বাংলাদেশের মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন এবং শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM trust) এর ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম. জি. আ.) বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জাতিগত নির্মূল অভিযানের নিষ্ঠুর পোড়ামাটি নীতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে তা বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ এবং মিয়ানমারের ভেতরে 'রাখাইনদের জন্য একটি নিরাপত্তা অঞ্চল' গঠনে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগের সাফল্য কামনা করেছেন।

পৃথিবীর অতি সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাসে এই জঘন্যতম মানবিক বিপর্যয় জাতিসংঘ সনদ, জেনেভা কনভেনশন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ পদদলিত করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনী নিরীহ, নিরস্ত রাখাইন মুসলিম-হিন্দু নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের উপর যে নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, তার নিন্দায় সোচ্চার বিশ্ববিবেকের প্রতি আমাদেরও সমর্থন রয়েছে।

তিনি বলেন, রাখাইনেরা জনসূত্রে সেখানকার নাগরিক এবং তাদের এই অলংঘনীয় অধিকার অস্বীকার করার কোন যুক্তি কারো থাকতে পারেনা। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অব্যাহত সহিংসতা, হত্যা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা রোধে তিনি অবিলম্বে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অংসান সূচীর প্রতি আবেদন জানান এবং দুর্গত মানবতার সেবায় দ্রুত এগিয়ে আসার জন্য তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ সচেতন মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম. জি. আ.), মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সমস্যাতে যুগপৎ জাতিগত, ধর্মীয় সর্বোপরি মানবিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে অভিহিত করে বলেন, কালাক্ষেপন না করে জাতিসংঘের কফি আনান কমিশনের সুপারিশ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ উন্মুক্ত হতে পারে।

তিনি বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ আরো জোরদার করার এবং বাংলাদেশে ঐতিহ্যিক ধারায় চলমান মানবিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় ও সংহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। তিনি রাখাইনের দুর্গত মানবতার মুক্তির জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের রহমত প্রার্থনা করেন।

সংবাদদাতা

ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি মহোদয়ের

তথ্য ও প্রকাশনা উপদেষ্টা

তারিখ: মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, চট্টগ্রাম।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে : গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত • আলোকধারা প্রতিবেদক •

বিগত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফস্থ গাউসিয়া হক মন্জিলের পূর্ব বাড়ি সম্মেলন কক্ষে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটিসমূহের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রত্যেক শাখা কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সহ কেন্দ্রীয় পর্ষদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় পর্ষদ সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ রেজাউল আলী জসীম চৌধুরী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্ষদ সহ-সভাপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বাবুল, এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের সচিব জনাব এ এন এম এ মোমিন এবং শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) রওজা শরিফের খাদেম মাওলানা এস এম সেলিম উল্লাহ।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, নাত-ই-রাসূল, মাইজভাণ্ডারী কালাম এবং গজল পরিবেশনের পর এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের উপর ভিডিও প্রদর্শনী ও বিস্তারিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন, এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি, রাহবারে আলম হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) এর আশীষ বাণী পাঠ করেন ট্রাস্ট সচিব জনাব এ এন এম এ মোমিন। দুই অধিবেশনে সমাপ্ত এ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ট্রাস্টের সমন্বয়ক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা তানভীর হোসাইন। প্রথম অধিবেশনে চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাউজান, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, বোয়ালখালী, পটিয়া, চন্দনাইশ, বাঁশখালী, আনোয়ারা, সাতকানিয়া, সীতাকুণ্ড, রাঙ্গুনিয়া, মিরসরাই, চট্টগ্রাম মহানগর, পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধিসহ বর্হিবিশ্বের উল্লেখযোগ্য শাখার সদস্যরা অংশ নেন এবং সংগঠনের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পর্ষদ সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন আহমদ সভাপতিত্ব করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট সচিব জনাব এ এন এম এ মোমিন এবং রওজা শরিফের খাদেম মাওলানা এস এম সেলিম উল্লাহ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, নাত-ই-রাসূল, মাইজভাণ্ডারী কালাম ও গজল পরিবেশন শেষে এস জেড

এইচ এম ট্রাস্টের নানামুখি কর্মকাণ্ডের উপর নির্মিত ভিডিও তথ্যচিত্র অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদেরকে প্রদর্শন করা হয়। সম্মেলনে গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন, এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি রাহবারে আলম হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) আশীষ বাণী পাঠ করেন ট্রাস্ট সচিব এ এন এম এ মোমিন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, নোয়াখালী, সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, ময়মনসিং, বরিশাল, ভোলা, মানিকগঞ্জ, মৌলভী বাজার, কুড়িগ্রাম, পাবনা, কুষ্টিয়া এবং মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি জেলার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব শাখা সমূহের সাংগঠনিক পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ দেন। মাওলানা এস এম সেলিম উল্লাহ'র পরিচালনায় মিলাদ এবং মুনাজাতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটি সমূহের বার্ষিক সম্মেলন ২০১৭-তে সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন, রাহবারে আলম, হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (মঃ জিঃ আঃ) পাঠকৃত আশীষবাণী আলোকধারা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে হুবহু পরিবেশন করা হল। সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সম্বলিত আশীষবাণীটি হলো নিম্নরূপ:

“মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পর্ষদ এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটিসমূহের বার্ষিক সম্মেলন ২০১৭”
বিশ্বওলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর একমাত্র পুত্র আওলাদে রাসূল, গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি, রাহবারে আলম, হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) এর আশীষ বাণী:

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির এই বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্টের কর্মকর্তাবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, শাখা কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত সমাবেশ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিশ্বওলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর

আশেকবন্দের সমন্বয়ে গঠিত ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সুফিপথ অনুরাগী দেশব্যাপী বিস্তৃত এই সংগঠনের প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য এই কেন্দ্রীয় সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে জানাই মোবারকবাদ। এ উপলক্ষে এই সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের উপর মহান আল্লাহতায়ালা অপর রহমত কামনা করছি। পরম করুণাময় রাব্বুল আলামিন এবং রাসূলে করিম, রাউফুর রাহিমের, রহমতুল্লিল আলামিনের রেজামন্দি, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, অছিয়ে গাউসুল আযম, শাহানশাহ বাবাজান এবং এই মহান সিলসিলার সমস্ত মাশায়েখে কেরামের নয়র করমের ফরিয়াদ করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি,

মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার বিকাশের এক অভূতপূর্ব সময়সন্ধিক্ষণে বিশ্বওলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মন্জিলে অবস্থান পুনর্বিন্যাস এবং স্বীয় মুর্শিদ কর্তৃক 'নিজ অবস্থায় প্রতিষ্ঠা' প্রদানের পরবর্তী সময়েই অছিয়ে গাউসুল আযমের পূর্ণ সম্মতি এবং অনুমতিক্রমে গাউসিয়া হক মন্জিলের তুরিকতের কর্মধারা সূচিত হয়। তাঁরই অনুমতিক্রমে, অছিয়ে গাউসুল আযমের কিছু একান্ত শিষ্য এবং শাহানশাহ বাবাজানের কতিপয় মুরিদ এবং আশেকভক্তের সমন্বয়ে শাহানশাহ বাবাজানের মন্জিলের এবং তুরিকতের কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য নিয়ে এন্তেজামিয়া কমিটি নামে শাহানশাহ বাবাজানের দয়ার্দ্র উপস্থিতি এবং তাঁরই বারাকাতময় মুনাযাতের মাধ্যমে এই সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করে। সেই থেকে সুগভীর নিষ্ঠা, চিন্তাশীলতা, সৃজনশীলতা, গঠনমূলক এবং দূরদর্শিতা নিয়ে এই সংগঠন নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমের চেষ্টা করেছে এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর তুরিকতের মিশনকে সর্বোচ্চ খেদমত দেয়ার আশ্রয় প্রয়াস চালিয়েছে।

সময়ের পরিক্রমায় শাহানশাহ বাবাজানের মহান বেলায়তের বারাকাতধন্য, কৃতজ্ঞ, স্রষ্টা অনুরাগী, ফজিলতে রাব্বানী প্রাপ্ত মহান সত্বাগণের দিকনির্দেশনাকামী, ঐশী প্রেম পিপাসু অগনিত জনসাধারণ গাউসিয়া হক মন্জিলে সমবেত হন। যার ফলে তুরিকতপন্থী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের প্রয়োজনে শাহানশাহ বাবাজানের মহান আশ্বাসবাণীর প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্নস্থানে সংগঠন গড়ে উঠে এবং এই সুমহান ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আজ আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন।

প্রিয় সমাবেশ,

ইতোমধ্যে চার দশকের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আমাদের মহান মুরশিদ, আমাদের রুহানি প্রেরণার মহান উৎস শাহানশাহ বাবাজান পর্দা করেছেন। এই সংগঠনের প্রাথমিক সময়ের অধিকাংশ মুরুব্বী ইন্তিকাল করেছেন।

শিশুরা যুবকে পরিণত হয়েছে এবং যুবকেরা বার্ধক্যে উপনীত। সময়, পরিবেশ, পরিস্থিতি, মনন পরিবর্তিত হয়েছে নতুন বাস্তবতায়। জাতীয় এবং বৈশ্বিক আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় মনোভূমিতেও এক বিপুল আলোড়নের ধ্বনি অনুরণিত এবং এর সবটুকুই যে কল্যাণকর তাও বলা যায় না। তুরিকত জগতের পরিবেশ পরিস্থিতি এর ব্যতিক্রম, কিংবা এই জটিল সময়ের মোকাবিলাতে সুফিসভ্যতা যে তার পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে অগ্রসর হতে পেরেছে সে দাবিও কেউ করছে না।

এমতাবস্থায় একদিকে এই সংগঠনের পথচলাকে বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ, নিরুদ্ভ করতে চাইছে, দায়িত্বপালনে ব্যর্থ করতে উদ্যত। আবার আরেকদিকে এই কঠিন বাস্তবতা আমাদের নৈতিক আধ্যাত্মিক অবস্থান থেকে আমাদেরকে নতুন উপলব্ধিজনিত প্রেরণা, তুরিকতের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আরো জোর কদমে আগুয়ান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আজকের এই সম্মেলন বিপুল গুরুত্ব বহন করছে। আমাদের ক্ষুদ্রসামর্থ্য নিয়ে, আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা প্রস্তুতি নিয়ে আমরা যদি কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত থাকতে পারি সেটাই হতে পারে আমাদের পরকালের মুক্তির সম্বল।

সম্মানিত প্রতিনিধিসভা,

আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছি, এই মহান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতির জন্য পরামর্শক হিসেবে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্ট কর্তৃক প্রণীত সাংগঠনিক করণীয় কাজের একটি বড়সড় তালিকা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা যদি সেই তালিকা ধরে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা করে অগ্রসর হই, যে মহান ওলির কদমে আমরা আছি এবং যে মহান গাউসুল আযমের ছায়ায় থাকার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের নয়র করমের সুপারিশে আল্লাহর অসীম রহমতে আমরা স্নাত হব এবং পরিণতিতে অকল্পনীয় খেদমত আমাদের দ্বারা আল্লাহ আ'য্যা ওয়া জাল্লা কবুল করতে পারেন ইন্শাআল্লাহ। আমরা নিশ্চিতভাবেই দুর্বল এবং সীমাবদ্ধ, কিন্তু এই ওয়র আমাদেরকে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে দিতে পারেনা।

দ্বীন, মযহাব, মিল্লাতের খেদমত, মানবতা, মযলুমের খেদমত, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দিকনির্দেশনা দিকে উপযুক্তভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব, শাহানশাহ বাবাজানের বেলায়তের মর্যাদা দিকে দিকে যুগোপযোগীভাবে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব, তুরিকতের ভাইগণের প্রতি সাংগঠনিক শিক্ষা, সহযোগিতা, নৈতিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা-সহযোগিতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্ব পালনে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভুলত্রুটি সীমাবদ্ধতা নিয়েও আমরা খুলুসিয়তের সাথে আমাদের দায়িত্ব পালনে আমরা অগ্রসরমান থাকবো ইন্শাআল্লাহ।

প্রিয় আশেকানে মাইজভাণ্ডারী,

আমরা জানি, মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা, ইসলামের সুফি সভ্যতার এক যুগোপযোগী সংস্কার। এই দ্বীনি সুফি দাওয়াতের বাস্তবতা এবং প্রয়োজনীয়তা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং যারা আজই তাদের বোঝাতে হবে। যারা না বুঝে প্রত্যাখ্যান করে তাদের বন্ধুত্বসুলভ আচরণে দাওয়াত জারি রাখতে হবে। যারা শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করে তাদের মর্যাদাপূর্ণভাবে উপেক্ষা অথবা নৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। সর্বোপরি নিজেদের দাওয়াত প্রদানের উপযুক্ততা অর্জন করতে হবে, জ্ঞানগতভাবে, সাংগঠনিকভাবে, আচরণগতভাবে।

যে সমস্ত তুরিকতের নীতিমালা, আদর্শ, মূল্যবোধ আমাদের আলাদাভাবে তুলে ধরতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের অনেককেই সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। আমাদের সংগঠনকে আদর্শ সাংগঠনিক নীতি কাঠামোতে গড়ে তুলতে হবে। স্রষ্টানুরাগ, শরীয়তের আনুগত্য, উসুলে সাবআ, বিচারসাম্য, ধর্মস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধনসাম্য, হুবিয়াত, ফজিলতে রব্বানি অর্জিত কামেল ব্যক্তিত্বের এতায়াত, সোহবত, তাওহিদে জময়ানী, নিত্যানিত্য বিভাজন, এলহাম, এলকা, আইনুল এক্বীন, হক্কুল এক্বীনলক্ক শরীয়তের বিশ্লেষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, মুহাসাবা, সংঘাত পরিহারকারী, দোষ বিবর্জিত আচরণ, গন্তব্যপথের উদ্দেশ্য অনুসারে বিচার-তথ্য মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে। আমাদের তুরিকা যে সমস্ত বিষয় পরিহারের তাগিদ দিয়েছে-নাস্তিকতা, অতি সঞ্চয়, অনর্থক অযথা অনিষ্টকর বিষয় পরিহার, উত্তেজনাগর সংঘাতপূর্ণ সমাধানের প্রয়াস, ধর্ম কিংবা তুরিকতের চতুর ব্যবসা রূপ প্রদান, তফরিক তথা বিভেদ সৃষ্টিকারী, পরদোষ চর্চা, মানবতা ধর্মের উপর আচার ধর্মের যেকোন মূল্য প্রাধান্য দানকারীগণের অহংকারী বিশ্লেষণ পরিহার, বৈষম্য, আঞ্চলিকতা পরিহার, সম্পদের মোহ পরিহার, খোদায়ী প্রাকৃতিক দানের অপব্যবহার ইত্যাদি। সংগঠনের কর্মসূচীর মধ্যে এ সমস্ত তাগিদগুলো যুক্ত করতে হবে।

সর্বোপরি, খোদায়ী ফজিলত প্রত্যাশী যে সমস্ত মানবসন্তান আপনাদের সাথে ধন সম্পদের মায়া, মোহ, লোভ ত্যাগ করে নানা স্থান হতে আপনাদের সাথে দরবারে আসা যাওয়া করেন এই প্রেমপ্রেরণা জাহতকারী কৌশলীর দ্বারপ্রান্তে ভক্তি শ্রদ্ধা এবং আযিযির অর্থ নিয়ে তারা যাতে খোদায়ী জজবা, প্রেমপ্রেরণা এবং মানবধর্ম তথা ইসলামের অহমজ্ঞানবর্জিত সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার প্রতিদান অর্জন করতে পারে তার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সমস্ত পরিশ্রম কবুল করুন। আমিন-বেহরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালিন!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত

সেমিনারে বক্তাদের অভিমত

“সুফিবাদ হচ্ছে ইসলাম ধর্মের প্রাণ”

॥ আলোকধারা প্রতিবেদক ॥

“ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানব ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই সুফিবাদী দর্শনের নির্যাস। তাঁরা হিংসা, বিদ্বেষ মুক্ত মানবপ্রেমের মাধ্যমে মানবিকতার বিকাশে তৎপর। মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব, মমতা, ভালবাসা এবং সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্বই সুফিদের কামনা।” গত ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী অডিটোরিয়ামে প্রফেসর ড. দিদারুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত “সুফি দর্শনে পরমত সহিষ্ণুতা ও বিশ্ব শান্তি” শীর্ষক সেমিনারের প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার এবং কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ সেকান্দর চৌধুরী। সেমিনারে “সুফি দর্শনে পরমত সহিষ্ণুতা ও বিশ্বশান্তি” শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ নুর হোসাইন।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক নুর হোসাইন সুফি দর্শনের ক্রমবিকাশ, তাত্ত্বিক ধারা, পবিত্র কুরআন, হাদিস, ইসলাম পূর্ব-সময়ে সুফি চিন্তা এবং সুফিদের বিকাশ, জিহাদ, সুফিবাদ, সন্তাস ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, সুফিরা নীতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে বিধায় জোর জবরদস্তি এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের সম্মতি প্রদান করে না। বলপূর্বক ধর্ম প্রচার এবং ধর্মান্তরে বাধ্যকরাকে তাঁরা সীমালংঘন হিসেবেই মনে করেন। সুফিরা সহজাতভাবে ধর্মীয় এবং সম্প্রদায়গত বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নৈকট্যপূর্ণ পারস্পরিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত। এটি মূলতঃ ইসলাম ধর্মেরই মর্মবাণী।

সেমিনারে আলোচক হিসেবে অংশ নেন রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সুলতান আহমেদ, রসায়ন বিভাগের প্রফেসর বেনু কুমার দে, সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ ওবায়দুল করিম, দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. এন, এইচ, এম আবু বকর, পালি বিভাগের প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু এবং আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ।

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী বৃত্তি তহবিলের 'মেধাবৃত্তি ২০১৭' ঘোষণা

'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীন 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল' পরিচালনা কমিটি আয়োজিত ২০১৭ পর্বের এককালীন মেধাবৃত্তি ঘোষণা উপলক্ষে এক সভা নগরীর বিবিরহাটস্থ 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বৃত্তি তহবিল পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু আহমদের সঞ্চালনায় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও বিজিএমইএর প্রাক্তন প্রথম সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন চৌধুরী। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী বৃত্তি তহবিল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬৩০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ১৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত স্কুলসমূহ হতে গত ২ বছরে ২০টি স্কুল থেকে ১০০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও চসিক ৭নং ওয়ার্ডের প্রান্তিক এলাকা হতে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকেও মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং ভবিষ্যতে এর ব্যাপ্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। এ লক্ষ্যে চলতি বছর ২০১৭ পর্বের মেধাবৃত্তির জন্য আবেদন ফরম বিতরণের ঘোষণা করা হয়। স্কুল উচ্চ বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি), কলেজ একাদশ শ্রেণি, দাখিল মাদ্রাসা (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি), আলিম ও ফায়িল প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১১ অক্টোবর ২০১৭ থেকে মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলস্থ 'মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্বদ' অফিস হতে আবেদন ফরম বিতরণ আরম্ভ হয়েছে। তাছাড়াও নগরীর বৃত্তি তহবিল অফিস, গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১ থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে। আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ফরম সংগ্রহ করে আগামী ৪ জানুয়ারি ২০১৮ এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বৃত্তি তহবিল পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দ রফিকুল আনোয়ার, সদস্য ড. মাওলানা জাফর উল্লাহ ও অধ্যাপক মোহাম্মদ গোফরান।

যোগাযোগ: ০১৯৯৮-৮৬৩৫৭২ অথবা ০১৮১৮-৭৫৪৯৬২

শাহানশাহ্ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্ট হতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে দ্রাণ বিতরণ

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭, মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলস্থ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) এর পক্ষ হতে প্রতিবেশী দেশ মায়ারমারের রাখাইন রাজ্যে নিপিড়িত, নির্যাতিত হয়ে প্রাণে বেঁচে আসা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আশ্রয়কৃত মায়ানমার সীমান্তবর্তী তম্বুর নামক দুর্গম এলাকায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ৬ হাজার পিস মেলামাইন ভাতের পেট, ২ হাজার পিস প্লাস্টিক গ্লাস, ১ হাজার পিস প্লাস্টিক জগ, ১ হাজার পিস প্লাস্টিক বদনা প্রায় ১২০০ পরিবারের মাঝে এই দ্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন-মাননীয় সংসদ সদস্য (কক্সবাজার-৩) জনাব সাইমুম সরওয়ার কমল ও যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্বদের সম্মানিত সভাপতি লায়ন আলহাজ্ব দিদারুল আলম চৌধুরী ও সফরসঙ্গীবৃন্দ।

এ সময় মাননীয় সংসদ সদস্য (কক্সবাজার-৩) জনাব সাইমুম সরওয়ার কমল শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ ট্রাস্ট মানবতার প্রতিটি স্তরে বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত। মানব সেবায় এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

পর্বদ সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব লায়ন দিদারুল আলম এ দুর্গম এলাকায় সুষ্ঠুভাবে দ্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন এবং বাংলাদেশে চলমান ঐতিহাসিক ধারার মানবিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় ও সংহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজিবি'র সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল মনজুর, যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্বদের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হালিম আল মাসুদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন ও তাজুল ইসলাম রাজু প্রমুখ।

সুফি উদ্ধৃতি

- তাসাওউফ হলো মানুষের উন্নত চরিত্রের নিদর্শন। যার চরিত্র বা আখলাক যত বেশি উন্নত, তার তাসাওউফও তত বেশি উন্নত।"

—হযরত শায়খ আবু বকর কেতানী (রহঃ)

- প্রত্যেক ইবাদতেরই সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর ওলীদের ইবাদতের সওয়াব নির্দিষ্ট এবং প্রকাশ্য নয় বরং তা আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।"

—হযরত আবুল হাসান খারকানী (রহঃ)



সম্প্রতি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী বৃত্তি তহিবলে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র পক্ষ থেকে চেক হস্তান্তর করছেন সিডিএ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবদুচ ছালাম



শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী ট্রাস্ট'র পক্ষ থেকে ৬টি সিএনজি চালিত অটোরিক্সা প্রদান করছেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আক্তার উননেছা শিউলি



'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় 'শুদ্ধ উচ্চারণ ও উপস্থাপনা কৌশল কোর্স-১-এ আলোচকবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) ট্রাস্ট'র ২৯তম বার্ষিক উরস্ শরিফ উপলক্ষে মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার মাসব্যাপী মানবসেবামূলক অনুষ্ঠানসমূহের ২টি চিত্র



মাঝিরঘাট ২৯ ও ৩০নং ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে দুস্থ মহিলাদের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন মাহজাবীন মোরশেদ এম.পি



মোহরা ৫নং ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান



শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাগুরী
মাইজভাগুর শরিফ, চট্টগ্রাম।
২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও
হিফযখানা, মাইজভাগুর শরিফ, চট্টগ্রাম।
৩. গাউসিয়া হক ভাগুরী ইসলামিক ইনস্টিটিউট (দাখিল),
পশ্চিম গোমদভী ৯নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
৪. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী
(কঃ) স্কুল, শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৫. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল
হক মাইজভাগুরী, হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
৬. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী
(কঃ) ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৭. শাহানশাহ্ হক ভাগুরী ফোরকানিয়া ও নূরানী
মাদ্রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাগুরী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা,
হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
৯. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাগুরী (কঃ) হিফযখানা ও এতিমখানা,
মনোহরদী, নরসিংদী।
১০. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব
লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১১. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল
হক মাইজভাগুরী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক,
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাগুরী
পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩. শাহানশাহ্ হক ভাগুরী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হক ভাগুরী,
বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ্ হক ভাগুরী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল
হক মাইজভাগুরী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৭. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. শাহানশাহ্ হক ভাগুরী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৯. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া
মাদ্রাসা, এয়াকবুদভী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২০. শাহানশাহ্ হক ভাগুরী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
২১. হক ভাগুরী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়া হাট,
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২২. শাহানশাহ্ হক ভাগুরী দায়রা শরিফ
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর,
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৩. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী
(কঃ) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই
(রেললাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৪. মাইজভাগুর শরিফ গণপাঠাগার।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- ◆ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাগুরী (কঃ) বৃত্তি তহবিল

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প:

- ◆ হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাগুর শরিফ)।

দরিদ্র বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- ◆ যাকাত তহবিল।
- ◆ দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাগুরী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- ◆ মাইজভাগুরী একাডেমি।
- ◆ আলোকধারা বুকস্
- ◆ মাসিক আলোকধারা।

আত্মোন্নয়নমূলক যুব সংগঠন : তাজকিয়া।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- ◆ মাইজভাগুরী মরমী গোষ্ঠী।
- ◆ মাইজভাগুরী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প:

- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদাতখানা,
নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথা।
- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহমদিয়া
গেইট সংলগ্ন, মাইজভাগুর শরিফ।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ:

- ◆ ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাগুর শরিফ)
ভ্রাম্যমান ওযুখানা ও টয়লেট।